হাদিসের ইতিহাস অনুসন্ধান

মুলঃ আল্লামা সাইয়েদ মুরতাজা আসকারী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান

হাদিসের ইতিহাস অনুসন্ধান

মুলঃ আল্লামা সাইয়েদ মুরতাজা আসকারী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান

সম্পাদনাঃ হাজি মোঃ সামিউল হক

প্রথম প্রকাশনাঃ ইসলামী সেমিনারী পাবলিকেশন্স, পাকিস্তান, ১৯৭৯ সাল ।

পূণঃ প্রকাশনাঃ ফরেন ডিপার্টমেন্ট অব বোনিয়াদ বা'দাতঃ ১৯৮৪ সাল । সোমায়ে এভিনিউ, তেহরান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ।

বাংলা অনুবাদ প্রকাশকঃ ইসলামী শিক্ষার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উৎসর্গ

ইসলামের অগ্রযাত্রার লক্ষে চিরস্মরণীয় গবেষণা কর্মের জন্য তার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার নিবেদন স্বরূপ এই অনুবাদ গ্রন্থটি উৎসর্গিত হলো গ্রন্থটির সম্মানিত লেখক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর উত্তর পুরুষ আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাজা আল- আসকারীর প্রতি।

উপক্রমণিকা

কোরআনী বিধি- বিধানের মূল স্পিরিট পূর্ণরূপে আয়ত্ব করার জন্য এবং ইসলামের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ রূপে অনুধাবন ও তা আমলে রূপান্তর করার উপলব্ধির জন্য অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহর সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। ইসলামের কোন বিধান কোরআন ও মহানবীর হাদীসের আলোকে উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এর সত্যিকার স্পিরিট এবং এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়াদি সত্যিকার অর্থে জানা সম্ভব হবে না।

ইসলামী বিধি- বিধানের ব্যাখ্যার জন্য হাদীসের বিধান অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দলিল। এই দলিল ব্যতিরেকে ইসলামের শিক্ষাকে উপলব্ধি বা অনুধাবন করতে পারার যে কোন দাবী একটি অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান বা অসার্থক প্রয়াস বৈ আর কিছু নয়। এই দাবীর সঠিকতা সম্পর্কে ইতিহাসই কেবল সাক্ষ্য হয়ে দাড়াতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) - এর ওফাতের পরপরই মুসলমানদের তথাকথিত শাসকবর্গ এই শক্তিশালী দলিলের (হাদীস) ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মম আচরণ প্রদর্শন করেছেন। শাসকবর্গ অত্যন্ত সঙ্গত কারণে হাদীসের বর্ণনাকারীগণকে দমন ও নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রেখেছেন, এমন কি মহানবীর সাহাবীদেরকে শুধুমাত্র হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান ও বর্ণনা করার অভিযোগে শাস্তির মুখোমুখি করেছেন। কোন নির্দিষ্ট শাসক বা খলিফার নাম উল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। তবে স্রোতধারা যখন এই নির্মম রীতির বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়ালো মুয়াবিয়া তখন নিকৃষ্টতম বি াস ঘাতকের ভূমিকায় অবতির্ণ হয়েছিলেন। তার নিয়োজিত ও বৃত্তিলাভকারী অনুগ্রহভাজন হাদীস বর্ণনাকারীরা তাদের কারখানায় তৈরী করতে থাকলো এক বিশাল সংখ্যক জাল ও বানোয়াট হাদীস; আর হাদীসের ভাষ্য প্রচলনের পবিত্র লেবাসের আড়ালে ঐ সকল জাল- বানোয়াট হাদীস অবৈধভাবে প্রবর্তন বা চালু করে দয়া হলো। এভাবে মুয়াবিয়ার পরোক্ষ সম্মতি ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় ভরি ভরি (জাল) হাদীস স্তুপীকৃত হতে থাকলো। আর তিনি (মুয়াবিয়া) সর্বোতভাবে সচেষ্ট ছিলেন এই সকল জাল হাদীসের সাহায্যে ইসলামের প্রকৃত

“অফিসিয়াল ইসলাম” প্রতিষ্ঠার জন্য । ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, হাদীস সংকলনকারীগণ এমন খারেজীদের নিকট হতেও হাদীস সংগ্রহ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণাদিত হয়ে সুচিন্তিতভাবে ইমাম আলী (আঃ) বা মহানবীর পরবর্তী বংশধর বা তাদের কোন সুহৃদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ এড়িয়ে গিয়েছেন অনায়াসে। এই স্বাভাবিক পক্রিয়ার মাধ্যমে মুয়াবিয়া ও তার উত্তরসূরী খলিফাদের তত্ত্বাবধানের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ মেকী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে। শিয়ারা এই ধরণের সকল জাল হাদীস প্রত্যাখ্যান করলেন, ফলে চিহ্নিত হলেন “রাফেজী” হিসেবে। সময়ের পরিক্রমায় চমে ত্যাগ- কোরবানী ও অতুলণীয় বিশাল শ্রো- প্রচেষ্টার মাধ্যমে , অবশ্য অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর উত্তরসূরী আহলুল বাইতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, তারা (শিয়া) ও তাদের শুভানুধ্যায়ীরা সহীহ্ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন এবং সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথকে সুবিন্যস্ত করেছেন ।

এই বিষয়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত সাইয়্যেদ মুরতাজা আল- আসকারী হাদীস সংকলনের এই স্পর্শকাতর বিষয়টির একটি সফল তথ্যানুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং অত্যন্ত সফলভাবে হাদীস সংকলনের এই প্রতিচ্ছবি এত চমৎকারভাবে উম্মোচন করেছেন যে, এর প্রতিটি বাক্য ও বক্তব্যের বিষয়াবলী সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । এই বিষয়ের উপর তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এই বিষয়টিকে আবেগমুক্তভাবে অবলোকন করার জন্য এবং সহীহ হাদীস হতে মিথ্যা ও জাল হাদীসকে পৃথকী করণের জন্য বি র সকল মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুসারে সঠিক রূপ ও অবয়বে ইসলামের পরিচিতি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হাদীসের সাহায্যে স্পষ্টায়নের কারণে তার এই উদ্দ্যোগ ইসলামের জন্যএকটি অত্যন্ত মহৎ সেবা হিসেবে পরিগণিত হবে।

গ্রন্থকার পরিচিতি

সাইয়্যেদ মুরতাজা আল আসকারী ফার্সী ও আরবী ভাষার প্রখ্যাত একজন পণ্ডিত। শিয়াদের একজন প্রথিতযশা লেখক হিসেবে তিনি সাহিত্য অঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে উঠেন।

হাদীসের বাস্তবতা সম্পর্কিত গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান সাইয়্যেদ মুরতাজা আল- আসকারীর একটি বিশেষ পছন্দের বিষয়। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে এই বিষয়টির উপর গবেষণা করেছেন এবং এক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছেন ।

ইসলামের অনুধাবন ও প্রসার আল্লামা আল আসকারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করে "দি ইসলামিক সেমিনারী" তার মূল্যবান গ্রন্থকর্মের সাথে মুসলিম বি কে পরিচয় করিয়ে দেয়াকে দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছে ।

আলোচ্য গ্রন্থটি হাদীস সংক্রান্ত ইতিহাসের একটি শক্তিশালী অনুসন্ধানী প্রয়াস। গ্রন্থকার তার যত্নশীল পরিশ্রম ও চিন্তাশীল এই কর্মের জন্য সর্বোতভাবে প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

বাংলা অনুবাদকের কথা

আল্ হামদুলিল্লাহ "গ্রন্থটি" হাদীসের ইতিহাসের বিবর্তন সংক্রান্ত একটি অকাট্য দলিল। ইসলামী অনুশাসন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ আজ বহু ফেরকায় বিভক্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর হাদীস অনুসারে,   মুসলিম উম্মাহ্ তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত থাকবে যার মধ্যে কেবলমাত্র একটি জামাত হবে জান্নাতী,   বাকী সব ক'টি জাহান্নামী। যারা পরকালের প্রতি স্থির বি াসী এবং দুনিয়ার জীবনকে পরকালীন জীবনের আলোকে পরিচালনার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের জন্য তেহাত্তর ফেরকার মধ্য হতে জান্নাতী জামাত খুজে বের করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই । কোরআন মানবজাতির জন্য হেদায়েতের পথনির্দেশিকা। কোরআন অটটু অবস্থায় মুসলমানদের মাঝে থাকার পরও তাদের আকিদা- বি াস ও কোরআনী অনুশাসন প্রতিপালনে তাদের মধ্যে বিরাজিত বহু মত পথের উপস্থিতির বাস্তব কারণ হল জাল হাদীসের উপস্থিতি । যে কোন সুস্থ্য ব্যক্তি বি াস করতে বাধ্য যে,   আকিদা- বি াস বা অনুশাসন প্রতিপালন যাই হাক না কেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধুমাত্র একটি নির্দেশই উপস্থাপন করেছেন । মতদ্বৈত্বতার উদ্ভব হয়েছে তার পরবর্তী সময়ের শাসকবর্গের কারণে । তবে,   একনিষ্ট অনুসারী যারা তারা সঠিক সুন্নাহকেই্ অনুসরণ করেছেন । তাই সঠিক সুন্নাহ চিহ্নিত করণের জন্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীস চিহ্নিত করণ অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমেই কেবল মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি হতে নিস্কৃতি পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে । বাংলা ভাষা- ভাষী যেসব পাঠক পরকালীন জীবনের আলোকে দনিয়ার জীবন গঠন করতে চায় সেসব পাঠকের জন্যেই আল্লামা আসকারীর এই মূল্যবাণ গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তর করার আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহামহিম আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমীন।

প্রথম খণ্ড

“সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগনকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরন করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেয়া হয়েছিল,স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসবার পরে,তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো,আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন”। (২১৩বাকারাঃ সুরা)

“তোমরা কি আশা এই কর যে, ইহুদীরা তোমাদের কথায় ইমান আনবে? যখন তাদের একদল আল্লাহর বানী শ্রবন করে, অতঃপর তারা উহা বিকৃত করে, অথচ তারা তা জানে”। (সুরা বাকারাঃ৭৫)

“সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্যপ্রাপ্তির জন্য বলে, ”ইহা আল্লাহর নিকট হতে”। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তি তাদের”। (সুরা বাকারাঃ৭৯)

ঐশী ধর্ম কেন সনাতন করা হয়?

মানব জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষের সাধারন রীতি- প্রবণতা হলো, তারা প্রত্যেক নবীর শিক্ষাকে নাটকীয়ভাবে রদ- বদল করেছে, এমনকি তাদের ঐশীগ্রন্থেও নতুন কিছু সংযোজন করেছে বা তাতে পরিবর্তন এনেছে। আল্লাহ পরবর্তী সময়ে তাঁর নির্ভেজাল বিধানাবলীসহ অন্য একজন নবী প্রেরণ করেছেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর প্রেরিত ঐশী ধর্মকে সনাতনরূপে উপস্থাপন করেছেন।

এই ঐশীবিধান প্রেরনের বিষয়টি অবশেষে রাসূল (সাঃ) এর আবির্ভাবের পর শেষ হয়, এবং পুর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে । এই পর্যায়ে আল্লাহ আগের সকল ঐশী ধর্মীয় বিধি- বিধানের বিপরীতে ইসলামের ধর্মীয় বিধি- বিধানকে চুড়ান্ত হিসাবে ঘোষনা করেছেন। আর এই কারনে যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা বিচ্যুতির হাত হতে ইসলামের এই ঐশীগ্রন্থ আল- কোরআনকে নিরাপত্তা প্রদান ও সংরক্ষনের দায়- দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে রেখেছেনঃ “আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক”(সুরা হিজরঃ৯)।

ইসলামী উম্মাহের মধ্যে মতভেদের কারন

নামায, যাকাত, হজ্ব এবং মানুষের প্রায়শই প্রয়োজনীয় অন্যান্য এবাদাত বা পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কিত ইসলামের এইসব ধর্মীয় ঐশী বিধানাবলীর মৌলিক এবং বুনিয়াদী নীতি- নির্দেশ আল- কোরআনের নির্ভুল ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলে (সাঃ) কোরআনে বর্ণিত ঐসব ঐশী বিধানের ব্যাখ্যা এবং বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি নামায কত রাকাত এবং নামাযে কি কি পড়তে হবে, কিভাবে পড়তে হবে তা নির্দিষ্ট করেছেন; সম্পদের যাকাত কি পরিমানে দিতে হবে এবং হজ্ব সম্পাদনের জন্য কি কি আহকাম পালন করতে হবে তা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। ধর্মীয় অন্যান্য আহকামের বিষয় নির্ধারণও রাসূলের (সাঃ) কার্যের আওতাভুক্ত ছিল।

ফলাফল দাড়ালো এই যে, যদিও ঐশী বিধানাবলীর সকল নীতি- নির্দেশ কোরআনে বর্ণিত আছে, তথাপি সেগুলোর বিশদ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূল (সাঃ) যা হাদিস নামে পরিচিত, এবং উহা অনুসরন করার জন্য আল্লাহ নিজেই নির্দেশ প্রদান করেছেন- বলেছেনঃ "রাসূল তোমাদিগকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তা হতে তোমরা বিরত থাক"(আল- কোরআন, সুরা হাশরঃ৭)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, কিছু কিছু মানুষ এমনকি রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। নবীজির (সাঃ) নামে তারা জাল হাদীস প্রচার করতে থাকে। নাহজুল বালাগায় বর্ণিত ইমাম আলী (আ.)- এর একটি খুতবা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে তিনি বলেনঃ "রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় কিছু লোক মিথ্যা হাদিস তৈরী করে তাঁর নামে প্রচার করছিল। (এই অনিষ্ট সম্পর্কে জানতে পেরে) একদা তিনি (রাসূল সাঃ) তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা বিষয় প্রচার করে সে নিজের জন্য জাহান্নামে স্থায়ী আবাস তৈরী করে"[১]

গোলযোগ সৃষ্টিকারী লোকজন নবীজীর ওফাতের পরও জাল হাদিস তৈরী করার অপকর্মটি অব্যাহত রাখে। এভাবে ইসলামের বিধিবিধান নানাবিধ বিচ্যুতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং মুসলমানদের মাঝে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। যেহেতু পবিত্র কোরআনের যেকোন ধরনের পরিবর্তন বা বিচ্যুতি হতে এর হেফাজত ও সংরক্ষনের ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন, কাজেই এইসব অনিষ্টকারক লোকেরা তাদের কলুষিত হস্ত প্রসারিত করে পবিত্র কোরআনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাকারক এবং বিশদ- অর্থ প্রকাশক রাসূল (সাঃ) এর হাদিসের দিকে। এই লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বানোয়াট হাদীস তৈরী করতে থাকে এবং রাসূলের (সাঃ) নামে প্রচার করতে থাকে। এই কারনে আমরা দেখতে পাই, কত ব্যাপক পরিমানে বিরোধ ও মতদ্বৈধতা মুসলিম সমাজে সহজ অবস্থান করে নিয়েছে। এর পরিমান এতই বেশী যে, এমনকি আকিদা- বি াসের শাখা প্রশাখার মতো মৌলিক বিষয়েও গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

এই লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তারা আল্লাহর গুনাবলীর বিষয়েও প্রশ্ন/তর্কের অবতারনা করেছিল। তাদের প্রশ্ন ছিলঃ "আল্লাহর হাত- পা আছে কি- না" অথবা "হাশরের ময়দানে তাঁকে দেখা যাবে কি না? দেখা গেলে, কিভাবে দেখা যাবে"?।[২] তারা আল- কোরআনের ব্যাপারেও বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন উথাপন করতে থাকে, যেমন, "আল- কোরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি, এবং ইহা কি অপরিবর্তনশীল কিছু নয়? নাকি ইহা আদি ও চিরন্তন "?

এইসব লোকেরা নবীগনের (আঃ) অবস্থান এবং সত্বার ব্যাপারেও প্রশ্নের অবতারনা করেছিল। তারা জিজ্ঞেস করতোঃ "নবীগন (আঃ) কি মাসুম(নিষ্পাপ)?" তাদের বি াস হলোঃ শুধুমাত্র ওহী প্রচার সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নবীগন মাসুম, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের গুনাহ করার অবকাশ আছে। অধিকন্তু, তারা রাসূলের (সাঃ) উপর ১ম ওহী নাজিলের বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন ধারনা পোষন করতো। তারা বলতোঃ"১ম ওহী নাজিলের সময় রাসূল (সাঃ) কি জীব্রাইল (আঃ) কে শয়তান মনে করেছিলেন, যিনি তাঁর সাথে ঠাট্টা- কৌতুক করতে চেয়েছিলেন"? অথবা, "নবীজী

জানতেন যে, তিনি পবিত্র সত্ত্বা এবং আল- কোরআন নাজিল হচ্ছে ও তাঁর অন্তরে চেতনা সঞ্চার করছে?"[৩]

ইসলামের সম্পুরক বিধি- বিধানের ব্যাপারেও তাদের অভিমত ছিল ভ্রান্ত; উদাহরন হলোঃ "ওজুর ক্ষেত্রে কোন লোক কি তার পা মাসেহ করবে, নাকি ধুয়ে পরিস্কার করবে; অথবা নামাজ আদায়ের শুরুতে কোন লোক যখন সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করবে, তখন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে শুরু করবে নাকি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" ছাড়া শুরু করবে; অথবা হজ্ব সম্পাদনকালে তাওয়াফুন্নেসা (২য় তাওয়াফ) বাধ্যতামুলক, বা বাধ্যতামুলক নয়?"[৪]

এই অবস্থার কারনে, ইসলামের সকল আকিদা- বি াস এবং আইন- বিধান বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনের বা রদ- বদলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই সকল মতদ্বৈধতা ও বৈসাদৃশ্যের মূলকারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি যে, বিরোধের সুচনা হয়েছে খলিফাদের (১ম- ৩য় খলিফা) সময়ে তাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে। রাজনৈতিক স্বার্থই ছিল তাদের শাসন এবং সিদ্ধান্তের চালিকা শক্তি। বিশাল একদল লোক নিয়োগ করা হয়েছিল কোরআনের আয়াতসমুহের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য; তারা তাদের সধ্যের সবটুকু দ্বারা কোরআনের আয়াতসমুহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করতো যাতে উহা শাসকবর্গের ইচ্ছা- আকাংখার অনুকুলে যায়[৫] তারা এই উদ্দেশ্যে রাসূলের (সাঃ) হাদিসেরও উদ্ধৃতি উল্লেখ করতো। ফলতঃ যে সকল নির্দেশ ঐ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সত্যায়িত হতো সেগুলোই হতো আইন। আর জবরদস্তিমুলকভাবে হলেও সেই সকল আইন জনগনকে মানতে বাধ্য করা হতো; ইসলামের সত্যিকারের স্পিরিটের আলোকে এই আইনগুলো প্রনীত বলে গন্য করানো হতো। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের আইনের প্রতি যেকোন বিরুপ মতামত তাদের দ্বারা সমর্থনযোগ্য হতোনা। আর তারা কোন আইন- বিধান জারী করার ইচ্ছা করলে ঐ নির্দেশ মানতে কেউ যদি অস্বিকার করতো, তাহলে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরনের পরিনতি ভোগ করতে হতো। মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রতিবাদী ব্যাক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি হতো। খলিফাদের কোরআন পরিপন্থি নির্দেশ- এর বিরোধীতাকারীদেরকেও এই ধরনের নিষ্ঠুর পরিনতি

ভোগ করতে হতো। এছাড়া শাসকবর্গ তাদের সরকারের অনুকূলে স্বার্থের কারনে শরিয়তী মাসায়েলগত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মুসলিম প্রজা কর্তৃক বিবর্ণ সুন্নাহর[৬] চার ইমামের কোন একজনকে মেনে চলার বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার সিদ্বান্ত গ্রহণ করে। এই ইমামগন হলেন, আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং মালেক ইবনে আনাস[৭] ঈমানের মৌ্লিক নীতিমালার (আকিদা) সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রজাগণ আশারীয় মতবাদকে[৮] অনুসরন করতে বাধ্য করা হতো।

মুসলমানদের এক বড় অংশ অনুসরনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সিহাহ সিত্তাহ[৯] বিশেষ করে "সহীহ মুসলিম" এবং "সহীহ বুখারীর" মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, এবং হাদিসের বিচার পর্যালোচনা হতে বিরত হয়ে নিজেদের জন্য হাদিস বিজ্ঞানের দরজা রুদ্ব করে দেয়। উল্লেখিত চার ধর্মীয় ইমামের একজনকে অনুসরনের ব্যাপারে তারা বাধ্য হওয়ায় গবেষনার রাস্তা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

যখন মুসলমানেরা খলিফার আদেশ পালনের জন্য এমনভাবে নিয়োজিত ছিল যে খলিফাদের পক্ষ হতে কোন হুকুম জারী হলে তাদের নিকট তা ঐশী নির্দেশ (ওহী) হিসাবে গণ্য হতো, সেই সময় মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু ব্যাক্তি ছিলেন যারা সকল ধরনের অসুবিধা মোকাবেলা করেও অকৃত্তিমভাবে ইসলামের আকিদা- বি াসকে যথাযথভাবে সংরক্ষনের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন এবং আল- কোরআনের নির্দেশনার আলোকে সকল হুকুম- বিধানকে কঠোরভাবে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন কষ্টকে তাঁরা কষ্ট মনে করতেন না। ধর্মীয় আহকাম- বিধানকে বিলুপ্তির হাত থেকে সংরক্ষনের কাজে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর হাদিসকে কোন ধরনের বিচ্যুতি বা পরিবর্তনের কবল হতে অবিকল সংরক্ষনের ব্যাপারেও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। এইসব ব্যাক্তিবর্গ ছিলেন নবী পরিবারের সদস্যবর্গের (আহলুল বায়েত আঃ) এবং তাঁদেরকে যারা আনুগত্য ও অনুসরন করতেন তাঁরা "শিয়া" নামে পরিচিত হন। শিয়া আলেমগন নীতিগতভাবে শুধুমাত্র সেইসব হাদিস গ্রহণ করতেন যা ইমামগন (আঃ) বর্ণনা করেছেন। একজন কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেনঃ

"তাদের অনুসরন কর যাদের কথা কোরআন ও হাদিস নির্দেশ করে"।

"আমাদের পিতামহ বর্ণনা করেন(যে শব্দাবলী পেয়েছেন) জীব্রাইল হতে এবং জীব্রাইল আল্লাহ হতে"।

শিয়া আলেমগন একেবারে সূচনালগ্ন হতে চলতি সময় পর্যন্ত অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের শিক্ষাকে সংরক্ষন ও প্রচার করেছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, জনগোষ্ঠীর বড় অংশই অনুসরন করতেছিল তাদের শাসকগোষ্ঠী ও রাজন্যবর্গকে। তাদের প্রভু ও রাজন্যবর্গ যা বলতো তাকেই সত্যিকার ইসলাম বলে তারা বি াস করতো। তাদের শাসকগন যে সকল বিষয় সঠিক বলে রায় দিত বা স্বীকার করতো এইসব লোকেরা সেগুলোকেই আল্লাহর বিধান বলে বি াস করতো। তাদের কাছে সেই হাদিসগুলোই ছিল একমাত্র সঠিক যা তাদের শাসকগন স্বীকার করতো।

এই রকম পরিস্তিতিতে, প্রকৃত ইসলাম হতে ক্রমান্বয়ে দূরে অগ্রসরমান ও প্রকৃত ইমামগনের অনুসরন- বিমুখ শাসকবর্গের অনুগত একদল লোক ইসলামী দুনিয়ায় আবির্ভুত হলো এবং নিজেদেরকে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত" হিসাবে দাবী করলো। আর যারা তৎকালীন শাসকবর্গকে অনুসরন করতে অস্বীকার করে আইন সম্মত ইমামগনের অনুসারী ছিল তাদেরকে "রাফেজী"[১০] হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। এই কারনে তৎকালীন শাসকগন ইমামগনকে, একজনের পর একজন, সীমাহীন কষ্ট- জুলুম এবং অত্যাচারে জর্জরিত করছিল, এবং তাদের সমর্থক ও অনুসারীদের উপর নানাবিধ বানানো অভিযোগ দ্বারা দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চালাচ্ছিল।

শিয়া মাযহাবের প্রখ্যাত আলেমগন এইসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের যুক্তি- প্রমানের ভিত্তির উপর অবস্থান গ্রহণ করে তার উপর দৃঢ় থাকেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের এবং সুন্নীধারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়সমুহ সুস্পষ্ট করে তোলেন এবং তাঁদের প্রেরনার উৎস প্রানবন্ত শিয়াধারার বিকাশ সাধনে সাফল্য আনয়ন করেন।

শিয়া আলেমগনের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে যারা এই কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাঁরা কয়েকজন হলেনঃ

ক) সাইয়েদ মোহসিন আমিন (ইন্তেকালঃ১৩৭১ হিজরী), "আইয়ান আল- শিয়া" গ্রন্থের লেখক।

খ) শেখ মুহাম্মাদ হুসাইন আল কাশিফ আল- গিতা (ইন্তেকালঃ১৩৭৩ হিঃ), "আসল আল- শিয়া ওয়া উসুলুহা" গ্রন্থের লেখক।

গ) শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ তেহরানী(১৩৯০ হিঃ), "আল- জারিয়াহ ইলা তাসনিফ আল- শিয়া" এবং "তাবাকাত আলম আল- শিয়া" গ্রন্থদ্বয়ের লেখক। মুহাম্মদ রেজা মোজাফফর, "আকায়েদ আল- ইমামিয়া" গ্রন্থের লেখক।

ঘ) মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাই, "শিয়া ইসলাম" গ্রন্থের লেখক।

এই আলেমগন অন্যান্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে শিয়া ও তাদের বি াসের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ ভুমিকা পালন করেছেন। এই মহান ব্যাক্তিবর্গের প্রত্যেকেই তাদের শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে এই পবিত্র দায়িত্ব পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেছেন।

আমাদের মতানুসারে, রাসূলের (সাঃ) নামে বানোয়াট তথাকথিত হাদিসের প্রচলন দ্বারা এবং তাঁর সিরাত লিখনের ক্ষেত্রে তথ্যের সত্য- মিথ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারনে যেহেতু বিরোধ ও মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে কাজেই যৌক্তিক কারনেই আমাদের উচিৎ হবে এই সমস্ত হাদিস ও তাদের লেখন- উৎসের তথ্যানুসন্ধান ও যাচাই- বাছাই করা, যাতে প্রবীন পণ্ডিতগনের বক্তব্যের উপর নির্ভরতা ও তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে চলার প্রবনতার কারনে সৃষ্ট জড়তার দেয়াল আমরা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হই। এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ কর্তৃত্বশীলদের নিকট বিনম্র বা অপ্রতিবাদী আত্নসমর্পনের কর্দমাক্ত অবস্থা হতে হাদিস ও ইতিহাস লেখকদেরকে আমরা বের করে আনতে পারবো, এবং আনুপুর্বিক পর্যালোচনা ও গভীর তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে হাদিস ও ইতিহাসের সঠিক জ্ঞানের রাস্তা আমরা উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবো।

এখন, আমাদের কর্তব্য হলো রাসূলের (সাঃ) হাদিস এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবীগনের, বিশেষ করে যারা হাদিস বর্ণনার কাজে জড়িত ছিলেন, তাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রজ্ঞা

বিচক্ষনতার সাথে পর্যালোচনা করা। তারপর আমরা পর্যালোচনা করবো হাদিস এবং বিভিন্ন মাযহাবের উপর সুচনালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত স্ব স্ব অনুসারীদের লিখিত গ্রন্থসমূহ। এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা যার মাধ্যমে আমরা সত্যের নিকটবর্তী হতে পারবো, এবং মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে বিরাজিত মতদ্বৈধতা সমুলে উৎপাটন করতে সক্ষম হবো।

মনীষীগনের মধ্যে যারা এই পথে অগ্রবর্তী ভুমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

ক) আবদ আল হুসাইন শরফুদ্দিন(ইন্তেকালঃ১৩৭৭ হিজরী); "আবু হোরায়রা" গ্রন্থের গ্রন্থকার।

খ)এই গ্রন্থের লেখক(আল্লামা মুরতাজা আসকারী রঃ); "দিরাসাহ ফিল হাদিস ওয়াল তারীখ"(ষ্টাডিজ ইন হাদিস এন্ড হিষ্টোরী) শিরোনামে ইতিহাস ও হাদিসের উপর তাঁর গবেষনা কর্মের সিরিজ প্রকাশনা রয়েছে। এই সিরিজের আওতায় বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিষয়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, তাদের উচিৎ ইমাম আলী (আঃ) এর সহিত সুলাইম ইবনে কা'ইয়েসের বাক্যালাপ অধ্যায়ন করা। সুলাইম বলেনঃ "আমি আমিরুল মু'মিনিনকে বললাম, "সালমান, মিকদাদ এবং আবুযর- এর নিকটে আল- কোরআনের উপর কিছু ব্যাখ্যা- টীকা- মন্তব্য শুনলাম। অন্যরা যা বলে তা এগুলো থেকে ভিন্ন।

অতঃপর আপনার নিকট হতে যা শুনলাম, তাদের (সালমান, মিকদাদ এবং আবুযর) নিকট হতে শুনেছি তার সাথে মিলে যায়। উপরন্তু, আল- কোরআন এবং রাসূলের (সাঃ) হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসাবে লোকদের নিকট যা প্রচলিত আছে আপনি সেগুলোর বিরোধিতা করেন এবং সেগুলোকে ভ্রান্ত/মিথ্যা বলে বিবেচনা করেন। আপনি কি মনে করেন যে, লোকেরা বিশেষ অভিপ্রায়ে উদ্দেশ্যমুলকভাবে নিজেদের মতো আল- কোরআনের ব্যাখ্যা করে রাসূলের (সাঃ) প্রতি মিথ্যারোপ করছে? "ইবনে কায়েস বলেন যে, ইমাম আলী (আঃ) তার দিকে ঘুরে গেলেন এবং বললেন, "জনগনের মাঝে সেই হাদিসগুলো প্রচলিত আছে যেগুলো হক ও বাতিল সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করে, সত্য ও মিথ্যা সংক্রান্ত বিষয়, হারাম ঘোষনা সংক্রান্ত আদেশ বিধান- এর খন্ডন সংক্রান্ত বিষয়, একই সাথে সার্বজনীন ও সুনিদিষ্ট- নির্ভুল বিষয়, সুস্পষ্ট ও প্রতিকী বা রূপক

বিষয়, এবং প্রকৃত ও কাল্পনিক বিষয়। ইহা অনস্বীকার্য সত্য যে, রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশাতেই লোকেরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। এর ফলে রাসূল (সাঃ) যখন বিষয়টি জানতে পারেন তিনি তৎক্ষনাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে খুতবা দেন এবং লোকদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক মিথ্যাবাদীকে সতর্ক করে দেন যে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নাম দিয়ে কোন মিথ্যা বিষয় প্রচার করে, সে জাহান্নামী ("কাফি", ইখতিলাফ আল হাদিস ১/৬২ থেকে, হাদিসের পরবর্তী অংশ নাহজুল বালাগা থেকে, খুতবা ২০১,)। অতঃপর তাঁর ইন্তেকালের পরেও তাঁর নামে মিথ্যাচার চালায় (তিনি বলেন), শুধুমাত্র চার ধরনের ব্যক্তি তোমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করে। তারা হলোঃ

১) দু'মুখো চরিত্রের লোক (মুনাফিক ব্যাক্তি), যে ঈমান ও ইসলামী জীবনাচারের প্রদর্শন করে কিন্তু কোনরূপ ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই সে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। এই ধরনের ব্যাক্তি রাসূলের (সাঃ) প্রতি মিথ্যারোপ করে। লোকেরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী বা মুনাফিক বলে ঘোষনা দেয়, তাহলে তার বর্ণিত হাদিস সঠিক বলে গ্রহণ করার কোন সুযোগ থাকেনা এবং সোজা-সাপ্টা তাকে প্রত্যাখ্যান আবশ্যক হয়। কিন্তু এমন লোক আছে যারা বলে, এই লোক রাসূলের (সাঃ) সাহাবী; তাঁকে সে দেখেছে এবং তাঁর নিকট হতে হাদিস শ্রবণ করেছে ও পেয়েছে। অতএব লোকেরা তার প্রতি আস্তাশীল থাকে। কিন্তু আল্লাহ দু'মুখো চরিত্রধারী, মুনাফিকদের আচরন- স্বভাব উল্লেখ করেছেন এবং তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন তাদের থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে।

রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালের পর মুনাফিকদের মধ্যে যারা বেচে ছিল তারা পথভ্রষ্ট নেতাদের ঘনিষ্ট সহচর হয়ে দাড়ালো, এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে তারা নিজ অনুসারীদেরসহ জাহান্নামে তাদের স্থায়ী নিবাস তৈরী করে নিলো। এইসব জাহান্নামী নেতারাই জনগনের শাসনকর্তা হয়ে উঠলো, তাদের জীবন ও সম্পদের উপর কর্তৃত্বশীল হয়ে উঠলো। যেসব লোক এইসব নেতাদেরকে জনগনের শাসনকর্তার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করলো তারা পুরস্কার পেলো দুনিয়াবী অজস্র সুবিধাদি; আল্লাহ যাদের হেফাজত করলেন তারা

ছাড়া অন্য লোকেরা দুনিয়া ও রাজন্যবর্গের সাথে আঠার মত লেগে থাকলো। উপরে বর্ণিত মুনাফিকেরা হলো পুর্বোল্লিখিত চার ধরনের ব্যক্তির একজন।

২) কোন ব্যক্তি রাসূলের (সাঃ) নিকট হতে কোন কিছু শুনেছে কিন্তু এর ভাববস্তু আত্মস্থ করে নি, সেই ব্যক্তি হাদিস বর্ণনা করলে তার বর্ণনা ভুল বলে পরিগনিত হবে। সে উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে মিথ্যা বলে না, কিন্তু হাদিস সম্পর্কে যা সে স্মরন করতে পারে তাই বর্ণনা করে এবং নিজে তা আমল করে, এই ধারনায় যে সে হাদিসটি শুনেছে রাসূলের (সাঃ) কাছ থেকে। এখন, মুসলমানরা যদি জানতে পারতো যে, সে নিজেই হাদিসটি যথাযথভাবে বুঝতে পারে নি তাহলে তারা গ্রহণ করতো না। যদি (হাদিস বর্ণনাকারী) জানতো যে সে হাদিসটি ভুল বুঝেছে, তাহলে সেও নিজে থেকেই উহা বাতিল বলে ঘোষনা করতো এবং উহা কখনো বর্ণনা করতো না।

৩) রাসূল (সাঃ) কোন একটি বিষয়ে আমল করার জন্য আদেশ করলেন এবং কোন লোক উহা জানতে পারলো। পরবর্তী সময়ে রাসূল (সাঃ) উক্ত আদেশ বাতিল করলেন ও লোকদেরকে উহা আমল করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু লোকটি (হাদিস বর্ণনাকারী) এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারলো না। অথবা সে কোন কিছু করার ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর কোন নিষেধাজ্ঞা জানলো অথচ পরবর্তী সময়ে রাসূল (সাঃ) উহা করার জন্য আদেশ দান করলেন। এই লোক (হাদিস বর্ণনাকারী) পুনরায় কৃত এই পরিবর্তন জানতে পারলো না, সুতরাং তার মনে থাকলো বাতিল আদেশ এবং ঐ বাতিল্করন সম্পর্কে অবহিত থাকলো না। যদি সে জানতো যে হাদিসটি বাতিল করা হয়েছে, সে উহা বর্ণনা করতো না, এবং আমলের আদেশ বাতিল হওয়ার কারনে সে বাতিল আদেশের উপর নিজেও আমল করতো না।

৪) এমন একজন লোক যিনি আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) উপর কখনো মিথ্যাচার করেননি; আল্লাহ- ভীতির (তাকওয়া)কারনে এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কারনে তিনি মিথ্যাকে ঘৃনা করতেন। তিনি ভুল কোন কিছু বর্ণনা করেন নি এবং তাঁর বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে কোন রূপ সন্দেহও ছিলনা; কিন্তু তিনি যা কিছুই শ্রবন করতেন উহার প্রকৃত রুপেই আত্মস্থ করতেন এবং উহা বর্ণনা করতেন। তিনি উহার সাথে কিছু যোগও করতেন না, কোন কিছু উহা

হতে বাদও দিতেন না। তিনি আদেশের রদকরনের বিষয় যথাযথভাবে স্মরন রাখতেন এবং তিনি উহার উপর নিজেও আমল করতেন, কিন্তু যেহেতু রদকৃত বিষয়টি তিনি মনে রাখতেন কাজেই তিনি ঐ কাজ নিজে করতেন না। সাধারন বা সার্বজনীন এবং সুনির্দিষ্ট আদেশ সম্পর্কে তাঁর ছিল পূর্ণ জ্ঞান এবং তিনি যথাস্থানে উহাদের প্রয়োগ করতেন। সুস্পষ্ট- সুনির্দিষ্ট ও রুপক হুকুম সম্পর্কে তার পুঙ্খানুপুংখ জ্ঞান ছিল।

কোন কোন সময় রাসূল (সাঃ) কোন বিষয় বলতেনঃযার দ্বিবিধ অর্থ হতো, একটি বক্তব্য কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করে এবং অন্যটি সকল কিছুকে সকল সময়ের জন্য নির্দেশ করে। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ঐ নির্দেশ দ্বারা প্রকৃত অর্থে কি হুকুম করেছিলেন যে ব্যক্তি তা জানতো না, এবং সময়ের অভাবের কারনে সে একে নিজে থেকে ব্যাখ্যা করলো উহার ঘোষনাকারীর প্রকৃত হুকুমের বিপরীতে (কোন কোন সময় রাসূল (সাঃ) কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে কোন নির্দেশ প্রদান করেছেন। অর্থাত সেই নির্দিষ্ট সময়েই সেই আদেশ প্রতিপালন করার বিষয়টি জড়িত, কিন্তু কোন সময়ে নয়)।

বিষয়টি এমন ছিল না যে সকল সাহাবীই রাসূল (সাঃ) কে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিল এবং উহা অনুধাবন করার জন্য তারা সকলেই তাদের প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেছিল, যাতে রাসূলের (সাঃ) নিকট কোন প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য তাদের কোন বন্দু বা অন্য কেউ(যাদের অধিকাংশই মরুবাসী)দীর্ঘ পথ ভ্রমন করে এলে তারা(সাহাবীরা) উহাদের জবাব এমন সন্তোষজনকভাবে দিচ্ছিল যেন তারা মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শ্রবন করছিল। এই ধরনের কিছুই আমার ব্যাপারে ঘটেনি। আমার ক্ষেত্রে আমি রাসূল (সাঃ) কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতাম এবং তার উত্তরে তিনি যা বলতেন আমি উহা মুখস্ত করে নিতাম।

এগুলোই হলো বিচ্যুতির কারন যা মানুষের মধ্যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি করেছে। হাদিসের বিভিন্ন ধরনের ননার কারনে সৃষ্ট এই অসঙ্গতি এবং বিরোধ মারাত্মক সমস্যা তৈরী করেছে (এই ব্যাপারে আরো জানার জন্য পড়ুনঃ ‘মিন তারিখ আলা হাদিসঃ’মুরতাযা আশকারী রঃ; শেখ

মাহমুদ আবু রিয়া- এর ‘আজোয়া আলা সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়াহ’; সাইয়েদ আব্দ আল হোসায়েন শরফুদ্দিন- এর”আবু হোরায়রা।)

আমরা ইমাম আলী (আঃ) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি যে, ইহা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে, এবং গবেষনা ও তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে রাসূলের (সাঃ) হাদিসের প্রকৃত অর্থ ও তার মমার্থ উদ্বারের জন্য দৃঢ়তার সাথে আমাদের আশু করনীয় সম্পর্কে উল্লেখ করে, যাতে সকল বিরোধ- মতপার্থক্য নির্মুল হয় এবং সকল সন্দেহের অপনোদন ঘটে। হে আল্লাহ! এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করুন,

“মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার মত অনেক রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ট প্রদর্শন করবে?এবং কেউ পৃষ্ট প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন”। (আল- কোরআন, আলে- ইমরানঃ১৪৪)।

“রাসূল তোমাদিগকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তা হতে তোমরা বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর”(সুরা হাশরঃ৫৯)”।

“এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়”(সুরা নাজমঃ৩- ৪)।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ধর্মীয় উত্তরাধীকার হিসাবে তাঁর অনুসারীদের জন্য দু'টো মূল্যবান সম্পদ রেখে গিয়েছেন। তা হলো, আল- কোরআন ও তাঁর আহলে বাইত। তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে অনুসরন করার এবং তাদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন[১১]

মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় জনগনের কাছে কোরাআনী বিধানের সকল সত্য ব্যাখ্যা করেছেন, এবং ইসলামী শিক্ষার মৌলবি াস, তাত্বিক জ্ঞান ও মতবাদ সংক্রান্ত সকল বিষয় হাদিসের আকারে তাঁর অনুসারীদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন। হাদিস প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ ঐ ব্যাক্তির প্রতি রহমত নাজিল করুন যে আমার নিকট থেকে মনোযোগের সাথে হাদিস শ্রবন করবে, তা বিশড্ভাবে গ্রহণ করবে এবং যিনি শুনেন নি ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছে দেবে। জনসমষ্টির এরকম ১টি বড় অংশ থাকবে যারা তাদের চেয়ে জ্ঞানী এবং অধিকতর বিজ্ঞ লোকের নিকট হাদিসের বানী পৌছে দেবে"[১২]

এখন আমরা দেখবো, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ পবিত্র কোরআন ও নবীর আহলে বাইতের প্রতি কি আচরন করেছিল এবং কিভাবে হাদিস সংক্রান্ত নির্দেশ তারা প্রতিপালন করেছিল।

এইসব লোকেরা রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইতের (আঃ) সদস্যবর্গকে সাধারন সমাজ থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং তাঁদেরকে নির্জনে বসবাসে বাধ্য করেছিল। তাঁদেরকে (আহলে বাইতের সদস্যবর্গকে) তারা অবর্ননী উৎপীড়নের সম্মুখীন করেছিল ঐ সময় বিরাজিত পরিস্তিতি সম্পর্কে] রাসূল (সাঃ) এর মহান সাহাবী সালমান এবং আবুজরতাঁদের বাগ্নিতা (রাঃ) পূর্ণ বানীতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত সালমান বলেন, "তোমরা এখন তোমাদের খারাপ কাজের ফলাফল দেখে অবাক হচ্ছ/পরিনাম (খেলাফত জবর দখল), এবং তোমরা হেদায়াতের মুল উৎস হতে বহু দুরবর্তী দথা স্থানে নিপতিত হয়েছোইবনে আবি আলা হাদিদ) , শারহে নাহজ আল বালাগা, ২১৩১/, ১৩২ এবং ৬(১৭/। তিনি আরো বলেন, "তোমাদের পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত খারাপ

কাজ(খেলাফত জবর দখল করে নেয়া)। তোমরা যদি ইমাম আলী (আঃ) এর বাইয়াত করতে, তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিজেদেরকে বেহেশ্তী এবং দুনিয়াবী রহমতের সাথে অবগাহন করতে পারতে”। হযরত আবু জরবলেন (রাঃ) , “তোমরা যদি সেই বিষয়ে প্রাধান্য দিতে যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তোমরা যদি সেসব বিষয় বর্জন করতে যেসব বিষয় আল্লাহ বর্জন করতে বলেছিলেন এবং যদি তোমরা রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইতের নেতৃত্ব এবং উত্তরাধিকার মেনে নিতে, তোমরা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে নিজেদেরকে অবগাহন করতে পারতে। কিন্তু তোমরা এমন খারাপ আচরন করেছিলে যে তা (রছিলেবর্তমান সময়ের জন্য ক), এখন তোমাদের সেই অন্যায় কাজের পরিনতি ভোগ করতে হবে এবং “যারা অন্যায় কাজ করে তারা অচিরেই জানবে কত বড় খারাপ পরিনাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে”] ।

যখন তারা খেলাফত যবর দখল করে নিতে সফল হলো, তখন তারা তাদের উচ্চাভিলাষ অনুসারে কোরাআন ব্যাখ্যার একছত্র প্রভাব নিশ্চিত করনের জন্য কোরাআন ও হাদিসকে (যে সহি হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা) পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলো। এবং কোরাআনকে তারা নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করলো; বিরোধী পক্ষের উপর খলিফা ও তাদের পরাক্রমশালী অনুসারীদের হামলার কুটকৌশলের প্রধান বাধা ছিল মহানবী (সাঃ) এর সহি হাদিস এবং তাঁর জীবনাচরন যা সাধারনভাবে সুন্নাহ নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং এই শক্তিশালি অস্ত্র হতে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করা ছাড়া খেলাফতের আর কোন বিকল্প ছিল না। ১ম দিকেই আবুবকর(রাঃ) এই কৌশলকে একক করে নিজের নিরঙ্কুশ অধিকারে নিয়ে নেওয়ার সিদ্বান্ত নিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি রাসূলের (সাঃ) ৫০০ হাদিস সংগ্রহ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখতে পেলেন, এই হাদিসগুলো তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক নয়। তাই তিনি তার সংগৃহিত সকল হাদিস পুড়িয়ে ফেললেন ।[১৩]

নিঃসন্দেহে ঐ সময়ে মানুষকে হাদিস বর্ণনা বা লিপিবদ্ধ করা হতে বিরত রাখা এবং কেবলমাত্র আবুবকরের সংগৃহিত হাদিস হতে লাভ নিতে বাধ্য করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এই প্রেক্ষিতে হাদিসের এই শক্তিশালী অস্ত্রের কাছে মানুষের যাওয়ার সুযোগ যাতে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে

রাসূলের (সাঃ) হাদিসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছাড়া ১ম খলিফা আর কোন উপায় দেখলেন না। অতএব খলিফা রাসূলের (সাঃ) হাদিস উদ্ধৃতির ব্যাপারে মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। এই কার্যপ্রেক্ষিতে তিনি একটি ঘোষনাপত্র জারী করলেন, যাতে বলা হলোঃ জনগন রাসূলের (সাঃ) হাদিস হতে কোন উদ্ধৃতি দিবে না এবং তারা শুধুমাত্র আল-কোরাআনকে অনুসরন করবে।[১৪] অভিসন্ধি হলো, আল- কোরাআনকে হাদিস হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাতে খলিফাগন নিজেদের ইচ্ছেমত আল- কোরাআনকে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

মৃত্যুর পূর্বে আবুবকর একটি অসিয়ত প্রস্তুত করেন, যার মাধ্যমে তিনি উমরকে খেলাফতের উত্তরাধিকার নিয়োগ করেন। কিন্তু সাধারন মুসলমানদের পক্ষ হতে এই খেলাফতের ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ আসেনি। নিঃসন্দেহে এর কারন হলো – হাদিস হতে বঞ্চিত থেকে অধিকাংশ মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকীর্নতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

এমন কি উমর তার শাসন আমলে হাদিসের উপর নিষেধাজ্ঞার এই নীতি কঠোরভাবে অনুসরন করেছেন। যাহোক, একদা তিনি জনগনের মতামত জানার অভিপ্রায়ে তাদের সামনে রাসূলের (সাঃ) হাদিস বর্ণনা এবং লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। হাদিসের উদ্ধৃতি এবং লিপিবদ্ধকরন রীতির পুনপ্রচলন করা জরুরী বলে এর অনুকুলে জনগন সার্বজনীন মতামত প্রদান করে। সামান্যের জন্য উমর যে ঝামেলায় পড়েছিলেন, সমস্যার ব্যাপারে ১মাস ধরে বিচার- বিবেচনা করার পর তা থেকে নিষ্কৃতির একটি রাস্তা অত্যন্ত চতুরতার সাথে বের করতে সক্ষম হলেন। তিনি জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিম্নের বক্তব্য ঘোষনা করলেনঃ

"আমি রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী, কিন্তু আমি স্মরন করছি আমার পূর্ববর্তি লোকদেরকে যারা কিছু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিল এবং এর প্রতি অত্যধিক মনোযগ প্রদান করে ঐশী গ্রন্থকে অবহেলা করেছিল; সুতরাং আমি সিদ্বান্ত নিয়েছি যে, আল- কোরানের সাথে অন্য কোন কিছুকেই মিশিয়ে ফেলবো না"[১৫]

(প্রিয় পাঠক, হযরত উমর একটি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কারন আমরা কোরাআন থেকে জেনেছি যে এটি লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত এবং এটি হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ

করেছেন। আর একারনেই আল- কোরাআন আজো পর্যন্ত অবিকৃত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে- সম্পাদক)।

রাসূলের (সাঃ) কোন সাহাবীকে তিনি (উমর) যখন কোথাও অফিসিয়াল কাজে পাঠাতেন তিনি তাদেরকে কোন ধরনের হাদিস বর্ণনা না করার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিতেন। তার আশংকা ছিল উহা মানুষকে আল- কোরানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে। উপরন্তু, তিনি যদি জানতে পারতেন যে তাদের কেউ তার নির্দেশ অমান্য করেছে, তাহলে তিনি তাকে তার সামনে হাজির হওয়ার আদেশ জারী করতেন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করতেন। এছাড়া জনগনের কারো কাছে কোন লিখিত হাদিসের খোজ পেলে তিনি সেগুলো নিয়ে যেতেন এবং পুড়িয়ে দিতেন।

এভাবেই উমরের খেলাফতকাল শেষ হলো এবং এসময় একটি সঙ্ঘবদ্ধ দলের অভ্যুদয় ঘটলো যাদের সহায়তায় উসমান (রাঃ) খেলাফতে অধিষ্টিত হলেন।[১৬]

উসমানের শাসন আমলে হাদিস বর্ণনার বিরুদ্ধে খেলাফতের শাসকবর্গ এক কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। উমর(রাঃ) যখন মহানবীর সাহাবীদেরকে (হাদিস বর্ণনার কারনে) নিপীড়ন করতেন ও মদীনায় কারাদন্ড দিতেন এবং তাদের লিপিবদ্ধ হাদিস পুড়িয়ে দিতেন, উসমান তখন রাসূলের (সাঃ) বক্তব্য ও তাঁর জীবনাচরনের বর্ণনা বন্ধ করার কতিপয় প্রথিতযশা সাহাবিকে নির্যাতনে জর্জরিত করেছেন বা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। উসাহরনস্বরূপ বলা যায়, হযরত আবুজর (রাঃ) কে মদীনা হতে বিতারন করে রাবজাহ মরুভুমিতে নির্বাসন দেন; ('মিন তারিখ আল হাদিস', লেখকঃ আল্লামা মুরতাযা আশকারী রঃ)।রাসূলের (সাঃ) এই সুপরিচিত সাহাবী উত্তপ্ত বালুকাময় নির্জন মরুভুমি এলাকায় মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে বাধ্য হন। রাসূলের (সাঃ) অন্য একজন সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে তিনি এমনভাবে বেত্রাঘাত করেন যে তিনি চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে পতিত হন।[১৭]

প্রথম ৩ খলিফার ২৫ বছর সময়ের শাসনকালে, গনঅভ্যুত্থানের ফলে উসমানের ক্ষমতাচ্যুতি ও হত্যাকান্ডের পুর্ব পর্যন্ত, মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগন ও ইসলামের অন্যান্য প্রজন্ম চরম

অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনপাত করছিল। অতঃপর জনগন ইমাম আলী (আঃ) এর প্রতি ফিরে আসে এবং তাঁকে তাদের পরবর্তি খলিফা নিযুক্ত করে।[১৮]

ইমাম আলী (আঃ) এমন সময়ে খেলাফতে অধিষ্টিত হলেন যখন মুসলমানেরা পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলের ২৫ বছরে তাদের নিজেদের স্টাইলে জীবন- যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐ সময়ে বিরাজিত পরিবেশ সম্পর্কে ইমাম আলী (আঃ) নিজে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো নিম্নরূপ।[১৯]

"আমার পূর্ববর্তী খলিফাগন এমন কাজ করেছিলেন যাতে তারা সচেতনভাবেই রাসুলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশের বিপরীতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি করা আনুগত্যের শপথ তারা ভঙ্গ করেছিল এবং তাঁর সুন্নতের পরিবর্তন করেছিল। এখন আমি যদি ঐ সকল বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করি এবং রাসূল (সাঃ) এর সময় যা ছিল সেইভাবে ঐ বিষয়গুলোকে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনি, তাহলে আমার বাহিনীর লোকেরা আমাকে নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় ফেলে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। খুব বেশী হলে এক ক্ষুদ্র সংখ্যক অনুসারী আমার পক্ষে থাকবে; যারা আল- কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আমার ইমামতকে স্বীকার করে"।

"আমি যদি নিম্ন বর্ণিত ব্যাবস্থাগুলো গ্রহণ করি তার ফলাফল কি হবে তা কি তোমরা ভাবতে পারো? :

১/রাসূল (সাঃ) যেখানে মাকামে ইব্রাহিমকে স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি আমি তা সেখানে পুনঃস্থাপন করি।

২/নবী কন্যা ফাতেমা (আঃ) এর সন্তানদেরকে আমি আমি যদি ফিদাকের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেই।

৩/মহানবী (সাঃ) এর সময় ওজন ও পরিমাপ যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদি সেই অবস্থায় তা প্রতিষ্ঠিত করি।

৪/যেসব ভুমি মহানবী (সাঃ) যাদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি সেগুলো তাদের কাছে ফিরিয়ে দেই।

৫/যদি খলিফাদের জারীকৃত নিষ্ঠুর আইন বাতিল করি।

৬/যদি যাকাত ব্যাবস্থাকে তার প্রকৃত ভিত্তির উপর পুনর্বিন্যাস্ত করি।

৭/যদি অজু গোসল ও নামাযের নিয়ম- নীতি সংশোধন করি।

৮/যে সকল মহিলাদের অন্যায়ভাবে তাদের স্বামীদের থেকে পৃথক করে অন্যদের নিকট দেওয়া হয়েছে, যদি তাদেরকে তাদের আসল স্বামীদের নিকট ফিরিয়ে দেই।

৯/বায়তুলমালের অর্থ যেভাবে ধনিকদের প্রদান করতঃশুধুমাত্র তাদের হাতে উহা পুঞ্জিভুত না করে মহানবী (সাঃ) এর সময়কালে যেমন ছিল তেমনিভাবে উহা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যাক্তিদের মাঝে সমভাবে বন্টন করি (হযরত উমর রাষ্ট্রিয় কোষাগার হতে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে সমাজে শ্রেনী বিভাজন চালু করেছিল। সেই সময়ে একটি তালিকা করা হয়েছিল এবং এই অনুযায়ি একদল পাচ্ছিল প্রতি বছর ৫০০০ দিরহাম, অন্য একদল ৪০০০ দিরহাম এবং অন্যান্যরা ৩০০০, ২০০০, ১০০০ এবং ৫০০ শত থেকে ২০০শত দিরহাম। এইভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেনী সৃষ্টি করা হয়)।

১০/যদি ভুমি কর বাতিল করি (হযরত উমর ইরাকের ভুমি কর আরোপ করেছিল ইরানের সাসানিদ রাজন্যদের ভুমি রাজস্ব আইন অনুসারে এবং মিশরে রোমান রাজন্যদের ভুমি রাজস্ব আইন অনুসারে)।

১১/যদি দাম্পত্য সম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল মুসলমানকে সমান ঘোষনা করি (হযরত উমর আরবীয় কন্যাদের সাথে অনারবদের বিবাহ নিষিদ্ব করেছিলেন)।

১২/যদি আল্লাহর আইন অনুসারে খুমস (সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) আদায় করি (সুরা আনফাল-৪১) প্রথম ৩ খলিফা মহানবী (সাঃ) ওফাতের পর খুমস হতে আহলে বায়াতের প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছিল)।

১৩/যদি মসজিদে নববীকে এর সুচনালগ্নের কাঠামোতে, যে কাঠামোতে রাসূল (সা.) এর সময়কালে প্রতিষ্টিত ছিল, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। মহানবী (সাঃ) ওফাতের পর মসজিদের যে প্রবেশ পথ গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল তা আবার খুলে দেই, এবং তাঁর ওফাতের পর যে প্রবেশ পথগুলো খোলা হয়েছিল তা আবার বন্ধ করে দেই।

১৪/যদি ওজুতে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা নিষিদ্ধ করি(‘খুফ’ হচ্ছে পশুর চামড়ার তৈরী মোজা। সুন্নী মুসলমানগন, তাদের পুর্ববর্তীদের মত, ওজুর জন্য নগ্ন পা ধোয়া বাধ্যতামুলক মনে করে, কিন্তু ‘খুফ’ দ্বারা পা আবৃত থাকলে উহা মাসেহ করা যথেষ্ট মনে করে)।

১৫/ “নাবিয” এবং খেজুরের মদপানের উপর দন্ড এবং বিশেষ শাস্তির বিধান চালু করি (নাবিয হচ্ছে একধরনের হাল্কা মদ, যা সাধারনত বিয়ার জাতীয় যব/বার্লি হতে তৈ্রি করা হয়)।

১৬/যদি নারী এবং হজ্বের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর সময়কালে যেমন ছিল, সেই মোতাবেক মু’তার বিধান আইনসিদ্ব করি (খলিফা উমর ২ ধরনের মুতাকে অবৈ্ধ ঘোষনা করেন। হজ্বের মুতা (হজ্বে তামাত্তু) ও নারীর মুতা। একইভাবে নির্দিষ্ট কন্যাদের বিবাহ, কোরআনের ঘোষনা ও সুন্নী পন্ডিতগনের বর্ণনা অনুযায়ী যা সুস্পষ্টভাবেই ইসলামি বিধানের অন্তর্ভুক্ত)।

১৭/যদি মৃত ব্যাক্তির জানাযার নামাযে ৫বার তাকবির বলি (আবু হোরায়রার সুত্রে সুন্নীগন মৃতের জানাজা নামাযে ৪ বার তাকবির পড়ে থাকে, সুত্রঃইবনে রুশদ আন্দালুসীর “বিদায়া ওয়াল মুজতাহিদ”১//২৪০)।

১৮/যদি নামাযের শুরুর সময় শব্দ করে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ তেলাওয়াত করা বাধ্যতামুলক করি (সুন্নিদের একটি গ্রুপ তেলাওয়াতের সময় সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা হতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বাদ দেয়। স্পষ্টতই তারা এই ব্যাপারে মুয়াবিয়াকে অনুসরন করে থাকে, সুত্রঃ আল- ফাতিহার তাফসীর, ‘তাফদীরে আল- কাশশাফ’১/২৪- ২৫)।

১৯/যদি মহানবী (সাঃ) এর সময়কালে তালাকের যে রীতি প্রচলিত ছিল, সেই রীতি কঠোরভাবে অনুসরনের নির্দেশ দেই (তালাক ২ বার....... . সুরা বাকারাহঃ২২৯, সুন্নিদের মতে তালাক দেওয়ার জন্য এক বৈঠকে ৩ তালাক উচ্চারন করলে তা বৈ্ধ, এবং এর যথাযথ সাক্ষী না থাকলে তা দ্রুত অনুসমর্থন করাতে হবে, সুত্রঃ’বিদায়াহ ওয়াল মুজতাহিদ ১/৮০- ৮৪)।

২০/যদি বিভিন্ন জাতির যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরনের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরনের নির্দেশ দেই।

“এক কথায় আমি যদি লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ অনুসরন করানোর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করি, তাহলে তারা আমায় ত্যাগ করবে এবং এদিক- সেদিক চলে যাবে”।

“আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যখন রমযানের মাসে ওয়াযিব (ফরয) নামায ছাড়া অন্য কোন নামায জামাতের সাথে না আদায় করার জন্য আমি লোকদেরকে নির্দেশ দিলাম এবং বুঝিয়ে বললাম যে মুস্তাহাব নামায জামাতের সাথে আদায় করা বিদায়াত, আমার সেনাবাহিনীর একটি দল, যারা আমার পক্ষে একদা যুদ্ধ করেছিল, হৈচৈ শুরু করে দিল, বলেঃ’আহ!উমরের সুন্নাত’। ‘হে মুসলমানেরা। আলী উমরের সুন্নাত পালটে দিতে চায় ও রমযান মাসে মুস্তাহাব নামায বন্ধ করে দেওয়ার বাসনা করে। তারা এমন গোলমাল শুরু করে দিল যে আমি ভীত হলাম- তারা কিনা বিদ্রোহ করে বসে”।

“হায়!”, ইমাম আলী (আঃ) বলতে থাকেন, “আহ এমন যন্ত্রনা আমি এই লোকদের হাতে ভোগ করলাম, যারা অত্যন্ত প্রবল ভাবে আমার বিরোধিতা করে; যারা তাদেরকে কেবলমাত্র জাহান্নামের দিকেই চালিত করেছিল তারা তাদের সেই ভ্রান্ত নেতাদের আনুগত্য করে”।

ইমাম আলী (আঃ) খলিফাদের রীতি- পদ্ধতির বিপরীতে বিশেষ করে হাদিস সংক্রান্ত বিষয়ে মহানবী (সাঃ) এর পথ অনুসরন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি **১**ম **৩** খলিফা কত্র্বক চালুকৃত বিদয়াত (নতুন রীতি পদ্ধতি)ধ্বংশ করার জন্য এক বিরামহীন যুদ্ব শুরু করেছিলেন (তিনি সকল কাহিনী কথকদের উপর, যারা উমর ও উসমানের নির্দেশ মোতাবেক জুময়ার দিনে মসজিদসমুহে খোতবা দিত, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। তিনি নবীজীর হাদিস মুক্তভাবে কোন লুকানো ছাড়াই বর্ণনার রীতি চালু করলেন। তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি খলিফাদের আবিস্কারসমুহের মুলোতপাটন করলেন। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ “ মিন তারিখ আল- হাদিস ।)

যারা ইমাম আলীর (আঃ) ভুমিকা তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতিকুল বিবেচনা করছিল কুরাইশদের সেইসব লোক তাঁর বিরুদ্বে দাঁড়িয়ে গেল। তারা “জামাল” এবং “সিফফিন” যুদ্বে প্রচুর রক্তপাতের

পরিস্থিতি তৈ্রী করলো। তাঁর বিরুদ্বে তাদের শত্রুতা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে প্রায় ৪ বছরের মধ্যেই তারা তাঁকে নামাজরত অবস্থায় শহীদ করে দিল।

আল্লাহ এবং রাসূলের (সাঃ) শত্রু মুয়াবিয়া তার ধুর্ত পরিকল্পিত চক্রান্তের ফলাফল হিসাবে হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর ইন্তেকালের কিছু সময়ের মধ্যেই খেলাফতের সিংহাসনে নিজেকে আসীন করতে সক্ষম হলো। মুগীরা ইবনে শোবা'র সাথে বাক্যালাপকালে তিনি তার রাজনৈ্তিক উচ্চাভিলাসের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। মুগিরা প্রশ্ন করলোঃ "হে আমিরুল মু'মিনিন, আপনার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আপনি সফল হয়েছেন। আজ কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা নেই যদি আপনি আপনার এই বৃদ্ব বয়সে লোকদের জন্য সুবিচারের ব্যাবস্থা করেন এবং সৎকাজ করেন যাতে আপনার পশ্চাতে সুনাম রেখে যেতে পারেন। আল্লাহর শপথ হাশেমীদের আজ এমন কিছুই নেই যাতে ভীত হতে হবে; সুতরাং আপনার পক্ষে এটাই উত্তম হবে যদি আপনি তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন এবং সম্পর্কের বাধনকে মজবুত করেন"।

মুয়াবিয়া প্রশ্নোত্তরে বললেনঃ "অসম্ভব। আবুবকর শাসক হল এবং সুবিচার প্রতিষ্টা করলো এবং সকল ধরনের দুর্ভোগ পোহালো, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পর পরই তার আর কিছুই আবশিষ্ট রইলো না, তার নাম আজ কেবল কদাচিত উচ্চারিত হয়। তারপর এলো উমর। তার শাসনকার্যকে সফল করার জন্য তিনি সর্বোত্তমভাবে সচেষ্ট ছিলেন, এবং তার ১০ বছরের শাসনকালে তিনি অনেক সমস্যা মোকাবেলা করলেন, কিন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার নামও মৃত্যু বরন করলো। তারপর উসমান, যে অত্যন্ত উচ্চ বংশের সন্তান, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো এবং উল্লেখযোগ্য বেশকিছু কাজ সম্পাদন করলো। অন্যরা করলো তার প্রতি অন্যায় আচরন এবং তিনিও মৃত্যবরন করলেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে নামটিও মাটির নীচে চলে গেল। লোকেরা তার মহৎ কাজগুলো সম্পুর্নরুপে বিস্মৃত হলো। কিন্তু ঐ হাশেমীর (আল্লাহর নবীর) নাম এখনও এই দুনিয়ায় রোজ ৫বার উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে। এই নামের অস্তিত্ব থাকাকালে কে জীবিত থাকতে পারে ? হে মাতৃহীন সাথী! না, আল্লাহর শপথ, যতক্ষন না এই পৃ্থিবীর ভুমি হতে তাঁর নাম মুছে ফেলতে পারবো ততক্ষন পর্যন্ত আমার কোন শান্তি নেই"।[২০]

এইভাবে মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর আহলে বাইতের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করার জন্য মুয়াবিয়া তার সকল ক্ষমতা, উপায়- উপকরন ব্যবহার করেছিল এবং হাদিস জাল করার নানা উপায়/কারখানা স্থাপন করেছিল। মুয়াবিয়া তার এই কাজে এতটা সফল হয়েছিল যে, আবু হোরায়রা যিনি ৫০৩০ টি হাদিস জাল করে মহানবীর নামে বর্ণনা করেছে ।[২১]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এই ধরনের ২০০০ হাজারেরও বেশী জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন। উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা ও আনাস বিন মালিক দু'জনের প্রত্যেকে ২০০০ হাজারের বেশী জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের মত অন্যরা স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্টীর আনুকুল্য পাওয়ার জন্য হাদিস জাল করার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আল্লাহই ভাল জানেন। এই প্রচারাভিযানকালে হাদিসের নামে কত অসংখ্য কাহিনী উদ্ভাবন করা হয়েছিল। এর ফলে ইসলামী নীতিমালা- বিধান এবং আমলের বিকৃতি সাধিত হয়েছিল এবং সব উলট- পালট করে দিয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় প্রকৃত ইসলাম সম্পুর্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

শাসকগোষ্টী কেবলমাত্র এই রুপান্তরিত ইসলামকে অফিসিয়াল স্বীকৃতি প্রদান করতো। এই ইসলামের বহিরাবরন ও মানদন্ড তৈরী হয়েছে মুয়াবিয়ার আমলে এবং এই ধারাবাহিকতার পথ ধরে ইহাই সত্য ইসলাম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ঐ বিষয়গুলো এখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর সত্য ইসলামকে যদি এই সকল দরবারী ইসলামে অভ্যস্ত লোকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, তবে প্রকৃত সত্য হিসাবে তা বি াস করা কঠিন হয়া দাড়ায়। কারন তারা তাদের ইসলামকে জেনেছে সেইসব গ্রন্থ থেকে যেগুলো মিথ্যা এবং জাল হাদিস সমৃদ্ব। উদাহরন স্বরুপ আবু হোরায়রার কারখানায় উদ্ভাবিত একটি জাল হাদিস আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারিঃ

" একদল লোক রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর নবী, হাশরের দিন আমরা কি আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হবো? তিনি জবাব দিলেন, " পুর্নিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তোমরা কি আনন্দ পাওনা?" " আমরা পাই" তারা উত্তর দিল। আবার তিনি বললেন, " মেঘমুক্ত আকাশে সুর্য দেখার ক্ষেত্রে তোমরা কোন অসুবিধা অনুভব কর কি?" তারা উত্তরে

বললো, " না, হে আল্লাহর নবী, করিনা। "তারপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে ঠিক একই রকমভাবে"। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সকল মানুষকে একত্রিত করবেন এবং দুনিয়াতে তারা যার ইবাদাত করতো তাকে অনুসরন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিবেন। যারা সুর্য পুজা করতো তারা সুর্যকে অনুসরন করবে এবং যারা চন্দ্রকে পুজা করতো তারা চন্দ্রকে অনুসরন করবে; এবং যারা প্রেত(অশুভ আত্মার)পুজা করতো তারা তাদের দেবতার পশ্চাতে চলতে থাকবে। কেবলমাত্র মুসলমান ও মুনাফিকেরা অবশিষ্ট থাকবে। অতপর লোকেরা পুর্বে যেরুপ আল্লাহর চিনতো তিনি তাদের সামনে ভিন্নরুপে আবির্ভুত হবেন, এবং বলবেন, " আমিই তোমাদের আল্লাহ"। তারা বলবেঃ আমরা তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই"। আমরা এখানে অপেক্ষা করবো যতক্ষন না আল্লাহ আমাদের সামনে উপস্থিত হন এবং আমরা তাকে চিনবো। তারপর আল্লাহ আবার তাদের সামনে সেইরুপে উপস্থিত হবেন যেরুপে লোকেরা আগে তাঁকে চিনতো। তখন লোকেরা চিৎকার করে বলবে, " নিশ্চয়ই তুমি আমাদের প্রভু" এবং তারা তাঁকে অনুসরন করবে"।[২২]

এই হাদিসটি স্পষ্টতই আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তি এবং পরকাল সম্পর্কে ইসলামের মুল বি াসকে নষ্ট করে দেয়।

অন্য ১টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষবিচারের দিনে মহানবী (সাঃ) আল্লাহর নিকট এইভাবে মুনাজাত করবেনঃ "হে আমার আল্লাহ আমি মুসলমানদের প্রতি রাগবশে যে বদদোয়া করেছি এর পরিবর্তে তুমি তাদের প্রতি রহম কর এবং তাদের পরিশুদ্ব করে দাও"।[২৩]

একইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একদা লোকদেরকে বললেনঃ "খেজুর গাছের পরাগিত হওয়ার প্রয়োজন নেই" অথবা, তিনি বলেছিলেন, "খেজুর গাছকে পরাগিত কর না, ইহাই তার জন্য ভাল হবে ।" সেই অনুসারে লোকজন খেজুরের চাষে পরাগিত করলোনা, ফলশ্রুতিতে ঐ বছর খেজুরের আশানুরূপ ফলন হল না । এবং মহানবী (সা.) যখন এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি বললেনঃ "আমি ঐ পর্যন্তই জানতাম । আমাকে আর কখনও

জিজ্ঞেস করো না” বা তিনি বলেছিলেন দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই ভাল জান” । (তার মানে দাড়াচ্ছে দুনিয়াবী বিষয়ে রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার অনুমোদন আছে ।)

আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন মহানবী (সাঃ) মক্কায় নামাজ আদায়কালে সুরা নাজম- এর এই আয়াত “ তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ “লাত” ও “উজ্জা” সম্বন্ধে এবং ৩য় আরেকটি “মানাত” সম্বরন্ধ? পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেছিলেন। যখন তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করতেছিলেন, শয়তান মহানবীর (সাঃ) মুখে এই শব্দাবলী জুড়ে দিলঃ “এরা হলো বিশিষ্ট দেবতা যারা ে তশুভ্র পাখির মত এবং তাদের অনুগ্রহ আকাংখিত”। মুর্তিপুজারীরা যখন এই শব্দগুলো শুনলো, তারা খুশী হয়ে গেল এই ভেবে যে, অবশেষে মহানবী (সাঃ) তাদের দেবতাদের সম্পর্কে ভাল বক্তব্য পেশ করলো, এবং একই সাথে সকল মুসলমান এবং কাফিররা সেজদায় চলে গেল। তারপর জীব্রাঈল আমিন (আঃ) অবতরন করলেন এবং রাসূলকে (সাঃ) তাঁর এই ভ্রান্তি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষন করলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন যে, শয়তান তার মুখে এই শব্দগুলো জুড়ে দিয়েছিল।

অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে, জীব্রাঈল (আঃ) মহানবী (সাঃ) কে সেই আয়াত পুনরায় তেলাওয়াত করতে বললেন, এই “এরা হলো বিশিষ্ট দেবতা” শব্দগুলো যোগ কর, রাসূল (সাঃ) তা করলেন। জীব্রাঈল তাকে বললেনঃ যে তিনি ঐ শব্দগুলো তাঁর কাছে নিয়ে আসেননি, এটা শয়তান যে তাঁকে (মহানবী) দিয়ে ঐ শব্দগুলো উচ্চারন করিয়েছে ।(“আমি তোমার পুর্বে যে সমস্ত রাসূল (সাঃ) কিংবা নবী প্রেরন করেছি তাদের কেহ যখনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষার কিছু প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদুরিত করেন”(সুরা হজ্জঃ৫২) এই মহিমান্বিত আয়াতের তাফসীরে সয়ুতি তার “দুররে মনসুর” নামক তাফসীর গ্রন্থে(৪/৩৬৬- ৩৬৮) এই বিষয়বস্তুর সমর্থনে বিখ্যাত সাহাবাদের সুত্রে ১৪টি হাদিস বর্ণনা করেছেন)।

এই বর্ণনাগুলো প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য সুন্নী পন্ডিত যেমন, তাবারী, ইবনে কাসীর, সুয়্যুতি এবং আল্লামা সাইয়েদ কুতুবের ভাষ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

এই সকল ব্যক্তিবর্গ মহানবী (সাঃ) এর নামে এত বিশাল সংখ্যক জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তারা মহানবীর (সাঃ) সঠিক রূপ মিথ্যা ও অসত্য বক্তব্যের পর্দার আড়ালে ঢেকে দিয়েছেন। কুরাইশ শাসকবর্গ ও তাদের কর্মকর্তাদের প্রতিকৃতি চিত্রিত হলো মেকি রঙে। অতিপ্রাকৃত গুনাবলি তাদের জন্য আবিস্কৃত হল, এবং তাদের বিরোধী পক্ষের ব্যক্তিবর্গ নিন্দার লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হল। উহা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে আবুযর গিফারী, মালিক আশতার, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং তাদের মত ব্যক্তিবর্গ আত্নাভিমানী এবং ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হিসাবে ঘোষিত হলো।[২৪] এছাড়া, তারা আল্লাহর গুনাবলী, পুরুত্থান ও শেষ বিচার, পুরস্কার ও শাস্তি, জান্নাত ও জাহান্নাম, পুর্ববতী নবীগনের কাহিনী, সৃষ্টির সুচনা, ইসলামী আকিদা- বি াস এবং বিধিবিধান সম্পর্কিত বহু হাদিস তারা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসম্পর্কিত তথ্যের উৎস ছিল তাদের নিজস্ব মস্তিস্কের উদ্ভাবন।

প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের অসংখ্য জাল করা হাদিস রয়েছে। এই জাল হাদিসগুলোর বর্ণনা ক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, ধর্ম সম্পর্কীয় সকল সত্য যেন ছায়ায় পরিনত হল, এবং এর পরিবর্তে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকবর্গের উদ্ভাবিত নতুন ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো; তুর্কী উসমানী খেলাফতের শেষ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা কার্যকরভাবে চালু ছিল।

ইসলামের ইতিহাসের সমগ্র অধ্যায় জুড়ে আর একদল লোকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যারা জাল হাদিস প্রস্তুতকারকদের বিরোধিতা করতো। এই দলের সদস্যবর্গ তাদের সাধ্যমত, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও, রাসূলের (সাঃ) সঠিক সুন্নাহকে সংরক্ষন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাসূলের (সাঃ) একজন বি স্ত সাহাবী আবুযর এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম অগ্রনী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একদিন তিনি একদল লোক পরিবেষ্টিত হয়ে মিনায় “২য় শয়তান”- এর নিকট বসে ছিলেন। লোকেরা তার নিকট ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করছিল। হঠাৎ উমাইয়া সরকারের শয়তান- প্রকৃতির একজন কর্মকর্তা তার নিকট এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, “লোকদের প্রশ্নের জবাব দান না করার জন্য তোমাকে কি সতর্ক করা হয়নি?” আবুযর জবাব দিলেন, “আমার উপর নজরদারী করার জন্য তুমিই কি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি”? এই কথা বলে

তিনি তার ঘাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, "যদি তুমি এইখানে তরবারি ধর এবং শরীর হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পুর্বে মহানবী (সাঃ) এর নিকট হতে যা আমি জানতে পেরেছি তার সামান্য কয়েকটি শব্দও উদ্ধৃতি দেওয়ার সুযোগ পাবো বলে আমি বুঝতে পারি, তবে অবশ্যই তা আমি করবো"।[২৫]

রাশিদ হিজরী নামে অন্য একজন মহান ব্যাক্তি এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন কুফার গভর্নর জিয়াদ তার হাত এবং পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক লোক সে সময় তাকে দেখতে এসেছিল এবং শোক প্রকাশ করছিল। রাশিদ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "কান্না বন্ধ কর, কিছু একটা নিয়ে আস যার দ্বারা লিখতে পারা যায়, কারন আমি তোমাদের সেই নির্দেশগুলো জানাতে চাই যা আমি আমার মাওলার কাছ থেকে জেনেছি"। লোকেরা একমত হলো। কিন্তু এই খবর জিয়াদের কাছে পৌছার পর জিয়াদ তার(রাশিদের) জিহবা কেটে দিল ।[২৬]

মিসাম- এ- তাম্মার এই দলের একজন সাহসী কর্মী ছিলেন। যখন ইবনে জিয়াদ তার হাত এবং পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং তাহে যখন ফাঁসিকাষ্টে ঝুলাতে যাচ্ছিল তখন তিনি মঞ্চে অতিকষ্টে একজন বক্তার মত দাড়ালেন এবং চিৎকার করে বললেন, "হে লোকেরা শুন, আমি ইমাম আলীর (আঃ) নিকট থেকে যে হাদিস টি শুনেছি তা শুনতে যার ইচ্ছা করে সে আমার কাছে আস"। লোকজন ফাঁসিকাষ্টের নিকট জমায়েত হলো মিসাম- এ- তাম্মার তখন বলতে শুরু করলেন। ইবনে জিয়াদ যখন এটা জানতে পারলো, সে তার (মিসাম) জিহবা কেটে দেবার নির্দেশ দিল। জহবা কেটে দেবার পর পরই মিসাম- এ- তাম্মার ১ ঘন্টার বেশী তীব্র যন্ত্রনা ভোগ করেন নি; ফাঁসিকাষ্টে রক্তের ঝর্ণার মাঝে শাহাদাত বরন করলেন।[২৭]

আমরা দেখতে পাই যে, রাজ্যে খেলাফতের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বিশালাকারে বেড়ে যাচ্ছিল। পর্যায়টা এমন দাড়িয়েছিল যে, তারা হালাল- হারাম সংক্রান্ত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) বিধান পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম ছিল। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় পৌছাল যে, খলিফাদের জারীকৃত আদেশ আল্লাহর বিধান হিসাবে কার্যকর হতে থাকলো।

যা হোক উসমানের খেলাফতের পর বেশীদিন এই পরিস্থিতি টিকতে পারেনি। গনঅভ্যুত্থান এই স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটায়। তবে জাল হাদিস প্রস্তুতকারক ও প্রচারনাকারী একদল শক্তিশালী লোকের সহায়তায় স্রোতধারা মুয়াবিয়ার দিকে ঘুরে গিয়েছিল। মুয়াবিয়া পুরনো রীতি-নীতি পুনঃপ্রচলনের জন্য একটি কার্যপরিকল্পনা নির্ধারন করলো।[২৮] এবং অতীতের সেই তথাকথিত গৌ্রবো ল রীতি পুনঃপ্রতিষ্টা করলো। তবে ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদাত এই সকল নীল- নকশা চিরতরে ব্যার্থ করে ছিল এবং তৎপরবর্তী খলিফাদের পক্ষে অতীত রীতি-নীতির পুনঃপ্রচলন আর কখনোই সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। এই কারনে সঠিক ইসলামের বিপরীতে দরবারী ইসলামের উদ্ভাবন ও সংযোজন কার্যক্রমের আর কোন উন্নতি দেখা যায়নি।[২৯] পরবতী খলিফারা নতুন কোন উদ্ভাবন চালু করতে পারেনি।

ইমাম হোসাইন (আঃ) এর শাহাদাত আরও একটি সুফল বয়ে এনেছিল। ইসলামের সঠিক রুপের অনুসারী এবং মহানবীর (সাঃ) হাদিস পুরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকারীদের প্রতি প্রতিশো মুলক কার্যাবলী, যেমন জেল- জুলুম, নির্দয় আচরন, অত্যাচার- নির্যাতন এবং হত্যাকান্ড াস পেয়েছিল, কারন পরবর্তী রাজন্যবর্গ এই ধরনের যন্ত্রনাদায়ক ও অমানবিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। অতঃপর তারা পুববর্তী খলিফাদের নিয়োজিত কর্মীদের সৃষ্ট হাজার হাজার জাল হাদিস হতে সঠিক হাদিস বাছাই করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার সিদ্বান্ত নিল, এবং এইগুলো মুসলমানদের নিকট সহজলভ্য করে দিল।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফতে আরোহনের মাধ্যমে শতবর্ষ ধরে হাদিসের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটলো। হিজরী ২য় শতকের আগমনের সাথে সাথে দরবারী ইসলামের অনুসারীরা তাদের রাজন্যবর্গের নিকট হতে মহানবীর (সাঃ) হাদিস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি পেয়ে গেল। এই সুত্র ধরে মহানবীর এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনী ভিত্তিক বিশাল সংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হলো। কিন্তু তাদের হাজার হাজার সংখ্যকের মধ্যে সঠিক ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের সুত্রে পাওয়া গেল মাত্র অল্প কয়েকটি হাদিস। তবে যারা রাজন্যবর্গের নিকট তাদের বিবেক বিক্রয় করে দিয়েছিল সেইসব তথাকথিত বুদ্বিজীবীদের কাছে ঐ হাদিসগুলো স্বল্প

সংখ্যক হয়েও মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাড়িয়েছিল। এর থেকে উত্তরনের জন্য তারা দুটো পন্থা অবলম্বন করেছিলঃ

প্রথমতঃ বুদ্বিবৃত্তিকভাবে হাদিস বর্ণনাকারী (রা'বী)- দের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং হাদিস বাছাইকরন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সিদ্বান্ত গৃহীত হয় যে, যদি কোন রা'বী ইমাম আলী (আঃ) এর কোন সু দ বা সহযোগী হতো, তবে তার বর্ণনাকে দুর্বল বা মূল্যহীন ভাবা হতো ।[৩০]

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আলীর (আঃ) বর্ণনা বাদ দিয়ে তারা হাদিসের বই সংকলিত করেছিল।

এইভাবে সংকলিত হাদিস বইগুলোকে "সহীহ" হিসাবে তারা পরিচিত করালো এবং সেহুলো সংখ্যায় নির্দ্ধারিত হলো ছয়টি। তন্মধ্যে বোখারীকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হল, কারন তিনি ঐ পন্থা দু'টোর প্রতি বি স্ত ছিলেন সবচেয়ে বেশী। তিনি এমনকি খারেজী যেমন- উমর ইবনে খাত্তানের নিকট থেকেও হাদিস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ জাফর সাদিকের (আঃ) নিকট হতে কোন হাদিস তার সহীহতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। একইভাবে তিনি খলিফাদের বর্ণিত এই ধরনের সকল হাদিস, সেগুলো অসম্পুর্ন এবং টুকরা টুকরা হওয়া সত্বেও, তার সহীহতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই কারনেই দরবারী ইসলামের অনুসারীরা আল-কোরানের পর বোখারীর হাদিস গ্রন্থকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করে।

একই ভিত্তিতে আত্নজীবনী এবং ইতিহাসের গ্রন্থসমুহের মধ্যে তারিখে তাবারী- কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে গন্য করা হয়। কেননা তিনিও এই ক্ষেত্রে বোখারীর পদাংক অনুসরন করেছিলেন। তিনি নব- ইসলামের কর্মকর্তাদের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের সাথে ন্যুনতমভাবেও সাংঘর্ষিক হয় এমন কোন হাদিস তার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। অন্যদিকে তিনি সেই সকল হাদিসও তার গ্রন্থে উদ্ধৃতি হিসাবে এনেছেন যেগুলো খলিফাদের নিষ্ঠুর কার্যসমুহকে ন্যায়ানুগ প্রতিপন্ন করেছিল। এজন্য দেখা যায়, তাবারী তার গ্রন্থে ইসলামের শত্রুদের বানানো শত শত মনগড়া হাদিস বর্ণনা করেছেন, এবং এইভাবে মহানবী (সা) ও খলিফাদের সময়কালের ঐতিহাসিক সকল ঘটনাকে বিকৃত করেছেন।[৩১] এই কারনে সেই লেখক (তাবারী) খলিফা ও তাদের সহযোগিদের প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্যের

কারনে এত বিখ্যাত হয়েছিলেন যে, তিনি (তাবারী) ঐতিহাসিকগনের পুরোধা (নেতা) হিসাবে অভিহিত হন। তার পরবর্তী সময়ে ইবনে আসির, ইবনে কাসীর এবং ইবনে খালদুনের মত অন্যান্য ঐতিহাসিকগন মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার লেখনীর উপর নির্ভর করেছেন।[৩২]

৪র্থ হিজরী শতকের পরের সময়ে দরবারী ইসলামের অনুসারীরা ঐ ৬টি হাদিস গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ পরিচালনার ঘোষনা জারী করে।

ইতিহাস লেখকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাবারী ও তার অনুসারীদেরকে প্রধান উৎস হিসাবে গন্য করার পরিনামে লেখকগনের সংকলিত শত শত ইতিহাস, হাদিস এবং তাফসীরগ্রন্থ বিভ্রান্তির অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে ।[৩৩] এই পথ ধরে সঠিক ইসলামের মহানবীর (সাঃ) যা মানবজাতির জন্য অনুগ্রহ হিসাবে এনেছিলেন তার অনুসন্ধান এবং গবেষনা সকলের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

৪র্থ হিজরী শতকের পর হতে আজ পর্যন্ত মানবগোষ্টির প্রজন্মসমুহ সেই গ্রন্থকারগনকে অন্ধভাবে অনুসরন করেছিল। এর পরিনামে এখন, মহানবীর (সাঃ) আহলে বাইতের ধারার অনুসারীগনকে ব্যাতিক্রম হিসাবে বাদ দিলে, সকল মানুষ জানে যে, "হাদিস উদ্ভাবনকারীদের" মাধ্যমে বাস্তবরূপ প্রাপ্ত দরবারী ইসলামই হচ্ছে সর্বজনস্বীকৃত ইসলাম। অতপর আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের সঠিকরুপ, এর বিধিবিধান, আদেশ- নিষেধ, নীতিমালা ও আমল, ইতিহাস এবং অতীতের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের জীবনীর সঠিক চিত্র জানার পর সর্বপ্রধান বাধা হচ্ছে জাল হাদিসের অস্তিত্ব।

আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি তার আলোকে ইহা সময়ের অতিজরুরী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে যে, ইসলামী বিে র সকল প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানবান পন্ডিত সঠিক ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করতে অগ্রসর হবেন। ইহা খুজে পাবার একমাত্র উৎস হচ্ছে রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইতের (আঃ) ধারা। ।

ইহা সময়ের সবচাইতে বড় প্রয়োজন এবং ইসলামী বি ে র তথাঃ ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরান এবং অন্য দেশসসমূহের সকল প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানবান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে আমি ইহা উপস্থাপন করেছি। আমি আশা করি যে, আমাদের ধর্মীয় আলেম সমাজ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ, যারা মহানবীর ধর্মীয় উত্তরাধিকারের অভিভাবক তারা, আমার অবদানের প্রতি যথাযথ মনযোগ দিবেন এবং একটি অনু ল সাড়া প্রদান করবেন

পরিশিষ্ট

An Inquiry into the History of Hadith নামক গ্রন্থটিতে যারা হাদীস উদ্ভাবন এবং জালকরণে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়েছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের সেই খলিফাদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র সহকারে আলোচিত হয়েছে । তারা তাদের বেতনভুক্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরণের হাদীস সংযোজন ও সংকলন করতে এবং সেগুলোকে সহীহ হিসেবে পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে এর একটি প্রতিষ্ঠানিক বিকাশ সংঘটিত করেছিলেন । এই ক্ষেত্রে মহানবীর আহলে বাইতের বা তাদের অনুসারীদের উৎস হতে প্রাপ্ত হাদীসগুলো অবশ্যভাবে নিষিদ্ধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়েছিল । বনি উমাইয়া এবং বনি আব্বাসীয় শাসকরা এই সময় মহানবীর আহলে বাইতের মর্যাদা বা অসাধারণ অবস্থা জ্ঞাপক হাদীসগুলোকে প্রতিনিধিত্ব মূলক সংগ্রহ হিসেবে কদাচিৎ তাদের “অফিসিয়াল ইসলাম”- এর স্বীকৃতির আওতায় এনেছে । যাহোক, এই ধরণের সুসংগঠিত পরিমণ্ডল এবং এই কেম পরিস্থিতিতে মহানবীর আহলে বাইতের সদস্য বর্গের বিশেষ সমর্থন অথবা তাদের বিশেষ মর্যাদা জ্ঞাপক কোন হাদীস যদি সুন্নী হাদীস বেত্তাগণ্যরর উৎস হতে বর্ণিত হয়, তবে সেই হাদীসগুরোর সত্যতা স্বাভাবিকভাবেই কোনরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । পূর্ব পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত এই ধরণের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রদ্ধেয় সুন্নী হাদীস বেত্তাগণ্যরর “সিহাহ” গুলোতে এইরূপ হাদীসগুলো কিভাবে রক্ষিত হলো তা কার্যতঃ সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর এক ধরণের বিশেষ রহমত, এবং তা কোন মো’জেযার চেয়ে কোন অংশে কম নয় । এইরূপ হাদীসগুলোর একটি হলো “হাদীস আল- কিসা” (চাদরের হাদীস)। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুন্নী হাদীস বেত্তাগণ্যরর সকল নির্ভর যোগ্য উৎসের সূত্রে আল্লামা মুরতাজা আল- আসকারী এই হাদীসটি (হাদীস আল- কিসা) এখানে উপস্থাপন করেছেন। ইহা এই হাদীসটির সঠিকতার সপক্ষে একটি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে, যেমনটি শিয়া হাদীস বেত্ত্বাগণ নিজেরা একে সঠিক হিসেবে গণ্য করে।

হাদীসের আকারে ইহা একতোড়া সুবাসিত ফুল, যা মহানবী (সাঃ) এবং আহলে বাইতের শানে নাজিল হওয়া তাতঞ্ঝরি (পবিত্রতা)- এর আয়াতের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে দয়। এই হাদীসগুলো সুন্নী লেখকদের লিখিত সহীহ্ হাদীস, মুসনাদ এবং তাফসীর গ্রন্থ সমূহ হতে সংগৃহীত হয়েছে।
এই হাদীসটিকে হাদীস আল- কিসা" (চাদরের হাদীস) বলা হয়, কারণ আয়াতে তাতহীর যখন নাজিল হচ্ছিল তখন মহানবী (সাঃ) এবং তার আহলে বাইতের সদস্যবর্গ একটি চাদর –দ্বারা নিজেদের আবৃত করে রেখেছিলেন; এর মাধ্যমে তারা অন্য লোকদের হতে নিজেদেরকে পৃথক করে চিহ্নিত করেছিলেন। আরবী ভাষায় ঐ ধরণের চাদরকে 'আবা' বা 'কিসা' বলা হয় এবং অধিকাংশ হাদীসেই 'কিসা' শব্দ –দ্বারা ঐ অর্থ বুঝানো হয়েছে। এই কারণে তাদেরকে আসহাব আল- কিসা" এবং পাঞ্জাতন আলে আবা" হিসেবেও ভূষিত করা হয়"।
হাকিম তার "মুসতাদরাকে সাহিহাই" শীর্ষক গ্রন্থে ইবনে আবু জাফর ইবনে আবু তালেব[৩৪] হতে উদ্ধৃত করেছেনঃ "যখন মহানবী (সাঃ) উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহর পক্ষ হতে আয়াত নাজিল হওয়ার সময় আসন্ন, তখন তিনি বললেন, 'আমার কাছে ডাক! আমার কাছে ডাক!' সাফিয়া বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনার কাছে কাকে ডাকবো ?"
তিনি বললেনঃ আমার আহলে বাইতের সদস্যদের ডাক" তারা হলঃ আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন' (আল্লাহ তাদের উপর শা বর্ষণ করুন)। অতঃপর তাদেরকে রাসূল (সাঃ) - এর নিকটে ডাকা হল এবং তারা সকলে সেখানে সমবেত হলে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে একটি চাদর –দ্বারা আবৃত করলেন। অতঃপর দোয়ার জন্য তিনি তার হাত উদ্ধে তুলে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)। আমার এবং আমার বংশধরদের উপর তোমার রহমত নাজিল কর"। এই সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার আয়াত নাজিল করলেনঃ হে আহলে বাইত (নবী পরিবার)!আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে" (সূরাঃ আহযাব: আয়াত নং ৩৩)।
এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে হাকিম বলেন, বর্ণনার উৎস/সূত্র অনুসারে এই হাদীসটি সত্য এবং সঠিক"।

কিসার ধরন ও প্রকৃতি

(ক) উম্মুল মো'মেনীন আয়শা উদ্ধৃত হাদীস অনুসারেঃ

মুসলিম তার সহীহতে , হাকিম[৩৫] তার 'মুসতাদরাক'- এ, বায়হাকি তার 'সনানু আল- কুবরাতে এবং তাবারী, ইবনে কাসির এবং সুয়ূতী তাদের তাফসীরে এই আয়াত সম্পর্কে আয়শার নিম্নরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[৩৬]

একদিন মহানবী (সাঃ) তার একটি ছাপা চাদর নিয়ে ঘর হতে বের হলেন।[৩৭] এমন সময় হাসান (আঃ) তার নিকট আসলেন এবং মহানবী (সাঃ) তাকে কাছে নিলেন এবং চাদরের নিচে আবৃত করে নিলেন। তারপর হুসাইন (আঃ) আসলেন এবং মহানবী (সাঃ) তাকেও চাদরের নিচে আবৃত করে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা (আঃ) কাছে আসলেন এবং তাকেও চাদর দিয়ে আবৃত করা হলো। সবশেষে আসলেন আলী (আঃ) এবং তাকেও চাদরের নিচে আবৃত করে নেয়া হল। অতঃপর তিনি (মহানবী সাঃ) এই পবিত্র আয়াতটি তেলাওয়াত করলেনঃ হে আহলে বাইত! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে" (সূরাঃ আহযাব ৩৩)।

(খ) উম্মুল মো'মেনীন উম্মে সালামা'র হাদীস অনুসারেঃ[৩৮]

তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে এই পবিত্র আয়াত সম্পর্কে উম্মে সালামা'র নিম্নরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেনঃ "যখন এই আয়াত, হে আহলে বাইত (নবী পরিবার)!.. নাজিল হল, মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান, এবং হুসাইন (তাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)- কে তার নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার চাদরের নিচে তাদেরকে আবৃত করলেন"। অন্য একটি হাদীসে উম্মে সালামা বলেছেনঃ তিনি তার চাদর –দ্বারা তাদেরকে আবৃত করলেন। " এই হাদীসটি সুয়ূতিও তার তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং ইবনে কাসির তার তাফসীর গ্রন্থে একই ধরণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিসা –দ্বারা আবৃত নবী পরিবারের সদস্যগণ্যরর মর্যাদা

(**ক**(উমর বিন ইবনে সালমা'র বর্ণনা মতে : তাবারী এবং ইবনে কাসির তাদের তাফীসর গ্রন্থে, তিরমিজি তার সহীহতে এবং যাহাবী তার 'মুশকিল আল্ আসার' গ্রন্থে উমর[৩৯] বিন আবু সালমা'র সূত্রে নিম্নরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেনঃ এই আয়াত, "হে আহলে বাইত (নবী পরিবার)!, মহানবী (সাঃ) - এর উপর নাজিল হয়েছিল উম্মে সালামা'র গৃহে। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) হাসান, হুসাইন এবং ফাতেমা (আঃ) - কে ডাকলেন এবং তাদেরকে তার সম্মুখে বসালেন। তারপর তিনি আলী (আঃ) - কে ডাকলেন এবং তাকে তার পশ্চাতে বসালেন। অতঃপর তিনি নিজেকে সহ তাদের সকলকে তার চাদর –দ্বারা আবৃত করলেন এবং বললেনঃ এরাই হলো আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)। হে আল্লাহ ! অপবিত্রতা তাদের থেকে দূরে রাখো এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!

(**খ**(ওয়াসিলাত ইবনে আসকা এবং উম্মে সালামা'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারেঃ[৪০]

হাকিম তার "মুসতাদরাক" এবং হায়সামী তার "মাজমাউল্ জাওয়াদ" গ্রন্থে ওয়াসিলাত হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মহানবী (সাঃ) তার নিজের সম্মুখে আলী (আঃ) ও ফাতেমা (আঃ) কে এবং হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ) কে তার হাটুর উপর বা তার জানুর উপর বসিয়েছিলেন। এই হাদীসটি ইবনে কাসির ও সুয়ূতী তাদের তাফসীর গ্রন্থে এবং বায়হাকি তার সুনানে ও আহমদ বিন হাম্বল তার মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

নবী পরিবারের সদস্যগণ যে স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন

ক -আবু সাঈদ খুদরী'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারেঃ[৪১]

সুয়ূতী তার 'দররুল মনসুর'- এ আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেন, জীবরাঈল যখন অবতরণ করেন এবং এই আয়াত "হে আহলে বাইত(নবী পরিবার)!." পৌছে দেন তখন মহানবী (সাঃ) উম্মে সালামা'র ঘরে ছিলেন। " আবু সাঈদ বলেন, ঐ সময় মহানবী (সাঃ) হাসান, হুসাইন, ফাতেমা এবং আলী (আঃ) - কে ডাকলেন এবং তাদেরকে তার কাছে নিলেন এবং তাদেরকে তার চাদর –দ্বারা আবৃত করলেন। এই সময় উম্মে সালামাও পর্দার পিছনে বসে ছিলেন। মহানবী (সাঃ) বললেনঃ "এরাই হলো আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)। হে আল্লাহ ! অপবিত্রতা তাদের থেকে দূরে রাখো এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!

খ -উম্মুল মো'মেনীন উম্মে সালমা'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারে :

ইবনে কাসির, সুয়ূতী, বায়হাকি, যাহাবী এবং খাতীব (তার "তারীখে বাগদাদ") উম্মে সালমা'র বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেনঃ এই আয়াত "হে আহলে বাইত (নবী পরিবার)!." আমার ঘরে নাজিল হয়েছে এবং ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন (আঃ) ঐ ঘরে ছিলেন। মহনবী (সাঃ) তাদেরকে তার চাদর দিয়ে ঢেকেদিলেন এবং বললেনঃ এরাই হলো আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)। হে আল্লাহ ! অপবিত্রতা তাদের থেকে দূরে রাখো এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!" এবং হাকিমও তার "মুসতাদরাক"- এ্ উম্মে সালামা'র উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, এই আয়াত আমার ঘরে নাজিল হয়েছে"। নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থ সমূহেও উম্মে সালামা'র হাদীস উদ্ধৃত হয়েছেঃ

তিরমিজি তার "সহীহতে" ফাতেমা (আঃ) - এর অর্জন সম্পর্কিত অধ্যায়ে এবং অনুরূপ ভাবে "রিয়াজ আল- নুজরাহ্" এবং "তাহজীব্ আল- তাহজীব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ ! এরাই হলো আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)। অপবিত্রতা

তাদের থেকে দূরে রাখো এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!" আহমদ তার "মুসনাদ"- এ আরও বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা বলেছেন, করলাম, "আমি ঘরে আমার মাথা ঢুকিয়ে দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম আমিও কি আপনাদের অন্তর্ভূক্ত আছি?" মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে। "

হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর নবী! আমি কি আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র এরাই আমার আহলে বাইত (পরিবারের সদস্য)। হায় আল্লাহ ! আমার পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা আরও অনেক উচ্চ। "

যখন আয়াতটি নাজিল হয় তখন ঘরে কতজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

সয়ুতীর "তাফসীর" গ্রন্থে এবং "মুশকিল আল্ আসার" গ্রন্থে উম্মে সালামা'র হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেনঃ এই আয়াত "হে আহলে বাইত (নবী পরিবার)!." আমার ঘরে নাজিল হয়েছে এবং ঐ সময় ঘরে সাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথা-

জীব্রাঈল, মিকাঈল, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আঃ) এবং আমি ঘরের দরজার মাঝে দাড়িয়েছিলাম এবং বলেছিলামঃ

"হে আল্লাহর নবী! আমি কি আপনার পরিবারেরএকজন সদস্য নই?" মহানবী (সাঃ) জবাবে বললেনঃ তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং তুমি নবীর স্ত্রীগণ্যর একজন। "

আয়াতটি নাজিলকালে য পরিবেশের মধ্যে নবী পরিবারের সদস্যগণ ছিলেন তাবারী তার তাফসীরে আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা বলেছেনঃ "এই আয়াত আমার ঘরে নাজিল হয়েছে আমি ঘরের দরজায় দাড়িয়ে ছিলাম"। একই তাফসীর গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে সালামা বলেছেনঃ নবী পরিবারের সদস্যগণ তার চারদিক ঘিরে দাড়িয়েছিলেন এবং তার কাধে বহন করা চাদর –দ্বারা তিনি তাদেরকে আবৃত করলেন এবং বললেন, "এরাই হলো আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক)। অপবিত্রতা তাদের থেকে দূরে রাখো এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!" এবং আয়াতটি যখন নাজিল হয় তখন তারা মাটিতে বসে ছিলেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর নবী! আমি কি আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, মহানবী (সাঃ) কোন বিশেষ মর্যাদা আমার জন্য অনুমোদন করলেন না এবং বললেন, তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে। "

এ আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং স্পষ্টীকরণ

রাগীব তার “মুফরাদাত আল- কোরআন” শীর্ষক গ্রন্থে মূল শব্দ “রাওয়াদা” এর আওতায় ইহা বর্ণনা করেন। যখন বলা হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, অমুক অমুক বিষয়/জিনিস ঘটবে বা অমুক অমুক বিষয়/জিনিস ঘটবে না। আবার “রিজস” মূল শব্দের আওতায় তিনি বলেনঃ “রিজস” হল সই জিনিস যা মানষু ঘণা করে । তিনি আরও বলেন যে, “রিজস” হল চার প্রকার, যথাঃ প্রাকৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আইনগত বা এই তিনটির সমন্বয়ে কোন একটি। যেমন, লাশের জুয়া এবং বহুত্ববাদের পেশা প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আইনের দৃষ্টিকোণ হতে ঘৃণ্য । রাগীবের বক্তব্য এখানে শেষ হয়েছে। সূরাঃ হজ্বের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তা’য়ালা বলেনঃ “সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পুজার অপবিত্রতা” এবং সূরাঃ আল- আনআম- এর ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যারা বি াস করে না আল্লাহ তাহাদিগকে এইরূপ লজ্জাজনকভাবে লাঞ্ছিত করেন”। সূরাঃ আল- আনআম্ এর ১৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যদি না হয় মরা, বহমান রক্ত অথবা শুকরের মাংশ, কননা এইগুলো অবশ্যই অপবিত্র”। সূরাঃ তওবায় তিনি মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, “তাদের থেকে দূরে থাক, কারণ তারা মুনাফিক”। নূহ (আঃ) - এর লোকদের সম্পর্কে সূরাঃ আ’রাফের ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ “নূহ বলিলঃ তোমদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তা তোমদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; ”।

হযরত মারিয়াম সম্পর্কে সূরাঃ আলে ইমরানের ৪২ নং আয়াতে যে মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যখন ফেরেশতারা বলে, “হে মারিয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বি র নারীগণ্যর মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়ছেন” এই আয়াতের তাতহীর” শব্দ –দ্বারা সেই অর্থই বুঝানো হয়েছে। আর এই হাদীসে ‘কিসা’ হচ্ছে “আবার” ন্যায় একটি বহিরাবরণ।

হাদীসসমূহে উপস্থাপিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা

সুয়ূতী তার তাফসীরে ইবনে আব্বাসের সূত্রে উল্লেখ করে[৪২] "মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার সৃষ্টিকে দু' অংশে বিভক্ত করেছেন এবং আমাদেরকে করেছেন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম! তারপর তিনি বললেনঃ তিনি গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করলেন এবং আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করলেন সর্বোত্তম পরিবারসমূহে। এই আয়াত "হে নবীপরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে" সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা এই বিষয়টিই সুস্পষ্ট করে দিলেন। কাজেই আমি এবং আমার পরিবারবর্গ সকল ধরণের পাপ এবং অপবিত্রতা হতে মুক্ত"।

সুয়ুতী যাহহাক ইবনে মুজাহিম হতে বর্ণনা করেন[৪৩] যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আমরা সেই পরিবারের যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা পূতঃপবিত্র ঘোষণা করেছেন, এবং নবুওয়াতের উৎস এবং কেন্দ্রবিন্দু হতে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ঘর হলো সেই ঘর যেখানে সদাসর্বদা ফেরেশতাদের আগমন ঘটতো; এই ঘর রহমতের অবস্থানস্থল এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা"।

তাবারী (তার তাফসীরে) এবং মুহিব- ই- তাবারী (জাখায়েরূ আল- উকবা) আবু সাঈদ খুদরী হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে পাচঁ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে, যারা হলো: আমি নিজে, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন"। মুশকিল আল- আসার" নামক গ্রন্থে উম্মে সালামা হতে এই বিষয়ে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ "এই আয়াত নাজিল হয়েছিল মহানবী, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের সকলের উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক) - কে উদ্দেশ্য করে"।

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহে মহানবী (সাঃ) কিভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন এবং কিভাবে তার বক্তব্য ও আচরণ –দ্বারা এই বিষয়ের উপর আলোকপাত তা স্পষ্টায়ন করা হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনানুসারে, মহানবী (সাঃ) -এর এক প্রখ্যাত সাহাবী জায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মহানবী (সাঃ) -এর পরিবারের সদস্য বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং তার স্ত্রীগণও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কিনা। তিনি জবাবে বললেন।[৪৪] "স্ত্রীগণ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়। আল্লাহর কসম! একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে কিছু সময় বসবাস করে, অতঃপর তালাক প্রাপ্তা হলে তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়- স্বজনের কাছে ফিরে যায়। মহানবী (সাঃ) -এর পরিবারের সদস্য হলেন তারা যাদের সাথে তার পারিবারিক বন্ধন (রক্ত সম্পর্ক) আছে এবং যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ। "

"মাজমউল- জাওয়ায়েদ" গ্রন্থে হাশেমী বর্ণনা করেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী বলেছেনঃ "মহানবী (সাঃ) - এর পরিবারের সদস্য হলেন তারা যাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সকল ধরণের পংকিলতা এবং অপবিত্রতা হতে পবিত্র করেছেন এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র ঘাষণা করেছেন"। তারপর আবু সাঈদ খুদরী আঙ্গুল –দ্বারা তাদেরকে গণনা করলেন এবং বললেনঃ তারা হলেন পাচজন, মহানবী, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের সকলের উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক)"।

তাবারী তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, তাতহীর- এর পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেনঃ[৪৫] মহানবী (সাঃ) - এর পরিবারের লোক হলো তারা যাদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল পাপ হতে পবিত্র করেছেন এবং যাদের উপর বিশেষ রহমত অবতির্ণ করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন, "ইহাই ইহা এবং অন্য কিছু নয়, আল্লাহর আকাঙ্ক্ষা হলো সকল ধরণের খারাবী এবং গর্হিত বিষয় হতে মহানবী (সাঃ) - এর পরিবারের সদস্যবর্গ(আহলে বাইত)- কে মুক্ত রাখা এবং তাদেরকে সকল ধরণের পাপ- পংকিলতা হতে পবিত্র রাখা"।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূল (সাঃ) কী করেছিলেন?

“মাজমাউল জাওয়াদ” গ্রন্থে উল্লেখ আছে আবু বাজরা বলেছেনঃ[৪৬] “আমি মহানবী (সাঃ) - এর সাথে সাতমাস ধরে নামায আদায় করছিলাম। তিনি যখন তার ঘর হতে বের হতেন, তিনি হযরত ফাতেমা যাহরা(আলাইহা)- এর ঘরে যেতেন এবং বলতেনঃ “তোমদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। ”

সুয়ূতী তার তাফসীরে ইবনে আব্বাস হতে উল্লেখ করেছেনঃ আমি নয় মাস ধরে লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিদিন নামাযের সময় হলে মহানবী (সাঃ) আলী (আঃ) - এর দরজার কাছে যেতেন এবং বলতেনঃ “তোমদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে নবীপরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। এবং প্রতিদিন পাচবার তিনি ইহা পূনরাবৃত্তি করতেন। ”

সহীহ্ তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে তায়লাসি, “মুসতাদরাকে সহীহাইন” “আসাদ আল গাবা” এবং তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসির, সুয়ূতীর তাফসীর- এর উদ্ধৃতি মতে, আনাস ইবনে মালিক বলেছেন[৪৭] যে, ছয় মাস সময় ধরে মহানবী (সাঃ) হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ) - এর দরজার পাশ দিয়ে যেতেন এবং বলতেনঃ “হে নবী পরিবারের লোকেরা, এখন নামাযের সময়। ” তিনি আরও বলতেনঃ “হে আহলুল বাইত! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতেএবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। ”

“ইসতিয়াব” “আসাদ আল্ গাবা” “মাজমউ জাওয়াদ” “মুশকিল আল- আসার” এবং তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসির এবং সুয়ূতীর তাফসীর- এর উদ্ধৃতি মতে, আবু হামারা বলেছেনঃ “আমি মদীনায় থাকাকালে আট মাস সময়কাল ধরে দেখেছি যে ফজরের নামায আদায়ের জন্য যখন মহানবী (সাঃ) বের হতেন তিনি আলী (আঃ) - এর ঘরের কাছে যেতেন এবং দরজার দু’ই পাশে তার হাতগুলো স্থাপন করে বলতেনঃ “সালাত! সালাত! হে নবী পরিবারের

লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। ”

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে এই সময়কাল উল্লেখিত হয়েছে একটিতে ছয় মাস, অন্যটিতে সাত মাস, তৃতীয়টিতে আট মাস এবং চতুর্থটিতে নয় মাস।

“মাজমাউল জাওয়াদ” ও সুয়ূতী তাফসীর গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে শব্দাবলীর ভিন্নতা সহযোগে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) ফজরের ওয়াক্তে ৪০ দিন হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ)- এর ঘরের নিকটে গিয়েছিলেন এবং বলতেনঃ “তোমদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে নবী পরিবারের লোকেরা! নামাজের সময় সমাগত/আসন্ন। ” তৎপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করতেনঃ “হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে”। তারপর তিনি বলতেনঃ আমি তার সাথে যুদ্ধ করি যারা তোমদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তার জন্য শান্তি কামনা করি যারা তোমদের জন্য শান্তি কামনা করে। ”

এই পবিত্র আয়াত –দ্বারা সদস্য ঘণের শ্রেষ্ঠত্ব পমাণ করতেন

(**ক**) **ইমাম হাসান** (**আঃ**) :

হাকিম তার মুসতাদরাকে ইমাম হাসান (আঃ) - এর সাফল্য প্রসঙ্গে এবং হাশেমী আহলে বাইত (আঃ) - এর মর্যাদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসান (আঃ) তার পিতা ইমাম আলী (আঃ) - এর শাহাদাতের পর জনগণ্যর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন : হে জনগণ! আপনারা যারা আমাকে চিনেন তারা চিনেন, আর যারা না- চিনেন তাদের জানা উচিৎ যে আমি হচ্ছি হাসান ইবনে আলী। আমি মহানবী (সাঃ) এবং তার উত্তরাধিকারীর (ওসির) সন্তান। আমি তার সন্তান যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করেছিলেন এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। আমি হচ্ছি প্রো ল আলোকবর্তিকার সন্তান। আমি ঐ পরিবারের অধিভুক্ত যাদের কাছে জীব্রাঈল আগমন করতো এবং সেখান হতে বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করতো। আমি ঐ

পরিবারের অধিভূক্ত যাদের হতে আল্লাহ তা'য়ালা সকল অপবিত্রতা দুর করেছেন এবং যাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করেছেন। ”

মাজমাউল জাওয়াদ এবং তাফসীরে ইবনে কাসিরে বর্ণিত হয়েছে যে, পিতার শাহাদাতের পর ইমাম হাসান (আঃ) খেলাফতে আসীন হন। অতঃপর একদিন নামাযরত অবস্থায় একব্যক্তি তাকে আক্রমণ করে এবং তার উরুতে তরবারি –দ্বারা আঘাত করে। ফলে তিনি ক'য়েক মাস যাবৎ শয্যাশায়ী থাকেন। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে একটি খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেনঃ হে ইরাকের জনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আমরা তোমদের আমীর এবং তোমাদের মেহমান এবং সেই পরিবারের অধিভূক্ত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ “হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। ” ইমাম হাসান (আঃ) এই বিষয়ের উপর এত বেশী জোর দিয়েছিলেন যে, উপস্থিত সকলে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। ” তিবরানীও এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং বর্ণনাকারীদের সকলেই বি স্ত ।

(**খ**) **উম্মুল মো'মেনীন হযরত উম্মে সালামাঃ**

“মুশকিল আল- আসার” গ্রন্থে তাহাবী উমরা হামদানিয়া হতে উদ্ধৃত করেছেনঃ “আমি উম্মে সালামার নিকটে যেয়ে তাকে সালাম জানালাম। তিনি জানতে চাইলেনঃ আপনি কে?” আমি জবাব দিলামঃ আমি উমরা হামদানিয়া। ” উমরা বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মো'মেনীন! যাকে আমাদের মধ্যে আজ হত্যা করা হয়েছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন। জনসাধারণের একদল তাকে পছন্দ করে এবং অন্যদল তার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন। (তিনি হযরত আলী (আঃ) - এর কথা বলছিলেন)। উম্মে সালামা বললেনঃ “তুমি কি তাকে পছন্দ কর, অথবা তার প্রতি বিদ্বেষপরায়ন। ” জবাবে বললাম, “আমি তাকে পছন্দও করি না তার প্রতি বিদ্বেষপরায়নতাও রাখি না'। ” এখানে বর্ণনাটি ক্রুটিপূর্ণ , এবং তারপর বর্ণনাটি এই রকম পাওয়া যায়ঃ “আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেনঃ “হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল

চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করতে।”

সে সময় সে কক্ষে জীব্রাঈল, মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (আঃ) ব্যতীত আর কেউ ছিল না। আমি বললামঃ “হে আল্লাহর নবী! আমিও কি আহলে বাইতের লোকদের একজন? তিনি জবাব দিলেনঃ আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তোমার প্রতিফল প্রদান করবেন ’। আমি আকাঙ্ক্ষা করতে ছিলাম তিনি বলুন ‘হ্যাঁ’ এবং দুনিয়ার অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় এর মূল্য হতো অত্যন্ত অধিক। ”

(গ) **সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাসঃ**

সিনাই তার “খাসাইস”- এ আমির বিন সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে উদ্ধৃত করেছেন।[৪৮] তিনি বলেছেনঃ মুয়াবিয়া সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বললেনঃ আবু তোরাবকে গালি- গালাজ করা হতে তুমি বিরত থাক কন? সা’দ বললেনঃ “আমি মহানবী (সাঃ) - এর নিকট হতে তিনটি বিষয় শুনেছি, যার কারণে আমি আলী (আঃ) - এর প্রতি গালি- গালাজ করি না। যদি তার একটিও আমার থাকতো তবে আমি দুনিয়ার যে কোন কিছুর চেয়ে তার মূল্য বেশী দিতাম। আমি মহানবী (সাঃ) - এর নিকট হতে শুনেছি,

যখন আলী (আঃ) - কে মদীনায় তার প্রতিনিধি হিসেবে রেখে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অগসর হলেন, আলী (আঃ) বললেনঃ “আপনি কি আমাকে মদীনায় মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন ?” মহানবী (সাঃ) জবাব দিলেনঃ “তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও? তোমার সাথে আমার সম্পর্ক/অবস্থান মুসার সাথে যেমন হারুনের সম্পর্ক ছিল (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তুমি আমার নিকট সেই মর্যাদার অধিকারী হারুন মুসার নিকট যে মর্যাদার অধিকারী ছিল। ” (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

খায়বারের ভাগ্য নির্ধারনী দিনেও আমি মহানবী (সাঃ) - কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ “আমি আগামীকাল জিহাদের ঝাণ্ডা তার হাতে দিব যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলও তাকে ভাল বাসেন। ” এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমরা সকলেই এই

অনুগ্রহ ও সকলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্য গভীর আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছিলাম, এবং ঝাণ্ডা আমাদের হাতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। এই সময়ে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "আলীকে আমার কাছে আন।" ইমাম আলী (আঃ) উপস্থিত হলেন, কিন্তু তিনি তখন চোখের পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তার মুখের থুথু আলী (আঃ) - এর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং ঝাণ্ডাটি তার হাতে দিলেন। অধিকন্ত যখন আয়াতে তাতহীর (হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে) নাজিল হয়েছিল তখন মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ডেকে তার নিকটে বসালেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত।" ইবনে জারীর, ইবনে কাসির, হাকিম (তার মুসতাদরাক"- এ) এবং যাহাবী (তার মুশকিল আল- আসার- এ) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এই আয়াতটি নাজিলকালে মহানবী (সাঃ) আলী (আঃ) - কে তার দু'ই পুত্র এবং ফাতেমা (আঃ) সহ ডেকে নিলেন এবং তার নিজের চাদর –দ্বারা তাদের জড়িয়ে নিলেন এবং বললেন : "হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত।"

(**ঘ) ইবনে আব্বাস**

"তারিখে তাবারী" এবং "তারিখে ইবনে আসির"- এ বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাসের সাথে এক আলোচনাকালে উমর বললেনঃ "ঠিক তোমদের! হে বনি হাশিম ! ঈর্ষা, প্রবঞ্চনা- প্রতারনা এবং ঘৃণা ব্যতীত তোমদের অন্তরে আর কিছুই নেই, যা তোমাদের হৃদয় হতে দুর হচ্ছে না এবং তা নিঃশেষও করা হচ্ছে না।" ইবনে আব্বাস জবাবে বললেনঃ শান্ত হোন হে আমিরুল মো'মেনীন! ঈর্ষার দোষ ঐ সকল অন্তরের উপর আরোপ করবেন না যাদের হতে আল্লাহ তা'য়ালা সকল অপবিত্রতা দুর করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র করেছেন, কারন মহানবী (সাঃ) - এর অন্তরও বনী হাশেমীদের অন্তরগুলোর অন্যতম।"

(২) হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আহমাদ্ (তার "মুসনাদে") নেসাঈ (তার "খাসাইস"- এ) মুহিব্বে তিবরী (তার "রিয়াজ আল- নুজরা") ও হাশেমী (তার "মাজমাউল জাওয়াদে") আমর বিন

মায়মুন হতে বর্ণনা করেছেনঃ[৪৯] তিনি বলেছেনঃ “আমি ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলাম যখন নয় জন ব্যক্তি তার কাছে আসল এবং বললঃ হে আব্বাসের পুত্র! হয় আমাদের সাথে আস অথবা গাপনীয়তার সুযোগ দাও। ” তিনি বললেনঃ “আমি তোমদের সাথে যাব। ” বর্ণনাকারী বলেনঃ “সেই সময়ে ইবনে আব্বাসের চোখ ভাল ছিল এবং তিনি দেখতে পেতেন। ” বর্ণনাকারী বলেনঃ “তাদের পারস্পরিক আলোচনা হলো এবং তারা কি বিষয়ে আলোচনা করলেন সে সম্পর্কে আমি অ- জানা থাকলাম। ” কিছু সময় পরে ইবনে আব্বাস আমাদের কাছে ফিরে আসলেন। তিনি তখন তার জামা ধরে ঝাকাচ্ছিলেনএবং বলতে ছিলেনঃ[৫০] ‘তাদের ধিক্কার জানাই! তারা কিনা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলে যিনি দশটি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তার পরের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস ইমাম আলী (আঃ) - এর গুণ- বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশদ উল্লেখ করতে থাকেন যে পর্যন্ত না তিনি বলেনঃ ‘মহানবী (সাঃ) তার নিজের চাদর –দ্বারা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)- কে জড়িয়ে নিলেন এবং বললেনঃ “হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করতে। ”

(ঙ) **ওয়াসিলাত ইবনে আসকা’আঃ**

তাবারী এ আয়াতের তাফসীরে, ইবনে হাম্বল তার “মুসনাদ”- এ, হাকাম তার “মুসতাদরাক”- এ, বায়হাকী তার “সুনান”- এ, তাহাবী তার “মুশকিল আল- আসার”- এ এবং হাশেমী তার মাজমাউল জাওয়াদ”- এ আবু আম্মার- এর সূত্রে উদ্ধৃত করেন তিনি বলেছেনঃ[৫১] “যখন আলী (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা চলছিল এবং লোকেরা তার কুৎসা করছিল তখন আমি ওয়াসিলাত ইবনে আসকা’আ- এর সাথে বসে ছিলাম। যখন তারা যাওয়ার জন্য উঠে দাড়াল তিনি আমাকে বললেনঃ “বসে থাকুন যাতে আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে পারি যার সম্পর্কে তারা কুৎসা করতেছিল। আমি রাসূল (সাঃ) - এর সাথে ছিলাম যখন আলী (আঃ) , ফাতেমা (আঃ) , হাসান (আঃ) এবং হুসাইন (আঃ) তার নিকট পৌছেছিল এবং রাসূল (সাঃ) তাদের উপর চাদর বিছিয়ে

দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত। তাদের থেকে অপবিত্রতা দুর কর এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র করে দাও। ”

শিদ্দাদ ইবনে অব্দুল্লাহ - এর সূত্রে “আসাদ আল- গাবায়” উদ্ধৃত করা হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ আমি ওয়াসিলাত ইবনে আসকা’আ হতে শুনেছি যে, ইমাম হুসাইন (আঃ) - এর মস্তক যখন আনা হল একজন ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং তার পিতার কুৎসা করতেছিল। ওয়াসিলাত দাড়িয়ে গল এবং বললঃ “আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমি যখন হতে মহানবী (সাঃ) - কে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতেএবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করতে। ” আমি সর্বদা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন(তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)- কে ভালবেসেছি। ”

উম্মে সালামা বর্ণিত আরেকটি হাদীসঃ

আহমদ তার “মুসনাদ”- এ , তাবারী তার তাফসীরে এবং তাহাবী তার মুশকিল আল- আসার- এ, আসার”- এ শাহর ইবনে হৌসব- এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যখন ইমাম হুসাইন (আঃ) - এর শাহাদাতের খবর (মদীনায়) পৌছালো আমি রাসূল (সাঃ) - এর স্ত্রী উম্মে সালামাকে বলতে শুনলাম, তিনি বলেছেনঃ “তারা হুসাইন (আঃ) কে হত্যা করেছে ! আমি নিজে দেখেছি যে মহানবী (সাঃ) তার খায়বারের চাদর তাদের উপর বিছিয়ে দিলেনএবং বললেনঃ হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত! তাদের থেকে অপবিত্রতা দুর কর এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র করে দাও!। ”

(**চ**) **আলী ইবনে সাইন** (**আঃ**) :

তাবারী, ইবনে কাসির এবং সুয়ূতী তাদের তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, আলী ইবনে হুসাইন (আঃ) একজন সিরিয়াবাসীকে বললেনঃ “তুমি কি সূরা আহযাবের এই আয়াতটি পড়েছ, হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করতে। ”

সিরিয়াবাসী লোকটি বললঃ “এই আয়াত আপনার সাথে কি সম্পর্কযুক্ত ?” ইমাম জবাব দিলেন : ‘হ্যাঁ, ইহা আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত’।

খাওরাজমি তার “মাকতাল” নামক গ্রন্থে এই বর্ণনা নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেনঃ

“মহানবী (সাঃ) - এর প্রপৌত্র ইমাম হুসাইন (আঃ) - এর শাহাদাতের পর যখন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) ও মহানবী (সাঃ) - এর পরিবারভুক্ত অন্য বন্দীদেরকে দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দামেস্কের জামে মসজিদের পাশে জেলখানায় তাদেরকে রাখা হয়, একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাদের কাছে এগিয়ে আসে এবং জিজ্ঞাসা করেঃ “সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছেন, লোকদেরকে তোমদের হাত হতে রক্ষা করেছেন ও আমিরুল মু’মেনীন ইয়াজিদকে তোমদের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন’। আলী ইবনে হুসাইন (আঃ) জিজ্ঞাস করলেনঃ “হে বুদ্ধ লোক! আপনি কী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন?” লোকটি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর ইমাম (আঃ) জিজ্ঞাস করলেনঃ এই আয়াতটি কী তেলাওয়াত করেছেনঃ “আমি আমার নবুওয়াতী কাজের বিনিময়ে তোমদের কাছে আর কিছুই চাইনা, একমাত্র আমার নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা ছাড়া। ”

বৃদ্ধ লোকটি বললঃ “আমি ইহা তলাওয়াত করেছি। ” ইমাম (আঃ) বললেনঃ এই আয়াতটি কী পড়েছেনঃ “সুতরাং নিকটাত্মীয়কে দিবে তাদের প্রাপ্য অধিকার, এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও (সূরাঃ বনী ইসরাঈল : ২৬)। ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর অনুগ্রহ চায় এবং তাহারাই সফলকাম” এবং কারআনের এই আয়াত, “লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মো’মেন হও। (সূরাঃ আনফাল্ : ১)। বৃদ্ধ লোকটি জবাব দিলঃ হ্যাঁ, আমি এই আয়াতসমূহ পড়েছি। ” ইমাম (আঃ) বললেনঃ “আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, নিকটাত্মীয় শব্দ –দ্বারা আমাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং এই আয়াতসমূহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতির্ণ (নাজিল) হয়েছে। (ইমাম (আঃ) আরও বললেন :) কোরআন শরীফের এই আয়াতটি কী তেলাওয়াত

করেছেন যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেনঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতেএবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করতে।" বৃদ্ধ লোকটি বললঃ "হ্যাঁ, আমি ইহা তেলাওয়াত করেছি। " ইমাম (আঃ) বললেনঃ "নবী পরিবারের লোকেরা বলতে কী বুঝানো হয়েছে! আমরা হচ্ছি তারা যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষভাবে আয়াতে তাতহীর" এর সাথে সংযুক্ত করেছেন।

বৃদ্ধ লোকটি বললঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহর শপথ! আপনারা কী একই পরিবারভূক্ত?" ইমাম (আঃ) জবাব দিলেনঃ আমি আমার নানা রাসূলুল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমরা একই লোক। "

বৃদ্ধ লোকটি হতবাক হয়ে গল এবং তার বক্তব্যে ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর তার মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললঃ "হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাই এবং এই পরিবারের বিরুদ্ধে শত্রুতা আমি পরিত্যাগ করলাম এবং মুহাম্মদ (সাঃ) - এর পরিবারের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছি। "[৫২]

পূববর্তী বর্ণনাসমূহের সারাংশ

পূববর্তী বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে "হাদীস আল- কিসা" সম্পর্কে যে সারবস্তু পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ "যখন মহানবী (সাঃ) উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আয়াত নাজিল হওয়ার সময় সমুপস্থিত, তখন তিনি বললেন, "আমার কাছে ডাক! আমার কাছে ডাক!" সাফিয়া বললেনঃ "হে আল্লাহর নবী, আপনার কাছে কাকে ডাকবো?" তিনি বললেনঃ "আমার আহলে বাইতের সদস্যদের ডাক, তারা হলঃ আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন" (আল্লাহ তাদের উপর শান্তিবর্ষণ করুন)। তাদেরকে অতঃপর রাসূল (সাঃ) - এর নিকটে ডাকা হল এবং তারা সকলে সেখানে তাকে ঘিরে সমবেত হলে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে একটি ছাপযুক্ত খায়বারের চাদর – দ্বারা আবৃত করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত (পরিবারের লোক) এবং মুহাম্মদ ও তার বংশধরদের উপর তোমার রহমত নাজিল কর। " (এই সময়ে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেনঃ হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। " এই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তখন তারা (উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামা'র ঘরের) মেঝের উপর সমবেত ছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত! তাদের থেকে অপবিত্রতা দুর কর এবং তাদেরকে পূতঃপবিত্র করে দাও!। "

উম্মে সালামা তখন একটি পর্দার আড়ালে ছিলেন এবং তিনি বলেনঃ "ঐ সময় ঘরটিতে সাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথা- জীব্রাঈল, মিকাঈল, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আল্লাহ তাদের উপর শান্তিবর্ষণ করুন)। আমি পর্দার আড়াল হতে বের হয়ে এসে বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমি কীআপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে মহানবী (সাঃ) বলেননিঃ "হ্যাঁ, তুমি" বরং তিনি জবাবে বললেন, তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং তুমি নবীর উম্মুল মু'মেনীনগণের অন্তর্ভূক্ত। " আর অন্য এক

বর্ণনামতে উম্মে সালামা বলেছেনঃ "হে আল্লাহর নবী! আমি কী আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" মহানবী (সাঃ) জবাবে বললেনঃ তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র এরাই আমার আহলে বাইত (পরিবারের সদস্য) । "হে আল্লাহ ! আমার আহলুল বাইতের মর্যাদা আরও অনেক উচ্চ!। "

এই হাদীসের বর্ণনানুসারে, মহানবী (সাঃ) তার আহলে বাইতকে অন্যদের থেকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং নির্দেশ করেছেন তারা কে কে এবং আয়াতটি ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ "আমি নিজে এবং আমার আহলে বাইত (পরিবারের সদস্যবর্গ) সব ধরণের পাপ এবং অপবিত্রতা হতে মুক্ত"। তিনি এই বিষয়টি প্রকাশ্যে মসজিদে নববীতে মুসলমানদের সকলের সম্মুখে পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং নামাযের ওয়াক্তে হযরত আলী (আঃ) এবং হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ) - এর ঘরের দরজায় যেতেন এবং তাদের জন্য আয়াতে তাতহীর তেলাওয়াত করতেনঃ "হে আহলে বাইত, তোমদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে"।

অন্য এক বর্ণনামতে, তিনি ফজরের ওয়াক্তে আলী (আঃ) - এর ঘরের দরজার কাছে যেতেন এবং তার হাত দরজার উভয় পাশে স্থাপন করতেন এবং আয়াতটি তলাওয়াত করতেন। কতিপয় সাহাবী মহানবী (সাঃ) - এর এই কার্য্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা মহানবী (সা.)কে এরূপ করতে দেখেছেন ছয় মাস ধরে অথবা সাত মাস ধরে অথবা এক ভাষ্যমতে আট মাস ধরে অথবা অন্য এক ভাষ্যমতে কমবেশী ৯ মাস ধরে। প্রত্যেকে তাই উল্লেখ করেছেন যা তিনি দেখেছেন। মহানবী (সাঃ) - এর উদ্দেশ্য ছিল এই আয়াতের অর্থ- উদ্দেশ্য মৌখিকভাবে এবং সাথে সাথে ববেহারিকভাবে উপস্থাপন করা, এবং তার অনুসারীদের মাঝে এই পবিত্র আয়াতের ("আমরা তাদের প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কোরআন অবতির্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতির্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। " সূরাঃ নাহল্ঃ৪৪) মর্মার্থ অনুযায়ী এর

ব্যাখ্যা প্রকাশ করা, যাতে তারা বিষয়টি বিবেচনা করার অবকাশ পায়। এই বিষয়টি লোকদের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে, এমন কি রাসূল (সাঃ) - এর সাহাবাগণও মহানবী (সাঃ) - এর আহলে বাইত (আঃ) - এর পক্ষে এর ভিত্ততে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল। ইমাম হাসান (আঃ) , যিনি নিজেও কিসার” অন্তর্ভূক্ত লোকদের একজন, তার পিতার শাহাদাতের পর এই আয়াতের উপরভিত্তি করে একটি খুতবা দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেনঃ “আমি ঐ পরিবারের সন্তান যাদের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’য়ালা বলেছেনঃ আল্লাহ তা’য়ালা তাদের হতে সকল অপবিত্রতা দুর করেছেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পূতঃপবিত্র করেছেন। ” তরবারী –দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর অন্য এক খুতবায় তিনি বলেনঃ “আমি এমন একটি পরিবারের সন্তান যাদের হতে আল্লাহ তা’য়ালা প্রতিটি অপবিত্রতা দুর করেছেন এবং যাদেরকে পূতঃপবিত্র রেখেছেন। ”

উম্মুল মু’মেনীন উম্মে সালামা এই বিষয়ে উমরা হামদানিয়ার সাথে যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইমাম আলী (আঃ) সম্পর্কে এই আয়াত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আলী (আঃ) - কে গালা- গালি করা হতে বিরত থাকা প্রসঙ্গে সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মুয়াবিয়ার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই আয়াতের প্রসঙ্গ টেনেছেন। ইবনে আব্বাসও এই আয়াতটিকে ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) - এর দশটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং যারা তার, অর্থাৎ ইমাম আলী (আঃ) , সম্পর্কে অশালীন ভাষা ব্যবহার করতেছিল তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য এই আয়াতটি ব্যবহার করেছেন। যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই আয়াতের উপর নির্ভর করেছেন তাদের অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ওয়াসিলাত ইবনে আসাকা’আ যিনি ইমাম আলী (আঃ) - এর উপর গালা- গালি শ্রবণ করে তার উত্তর দিয়েছিলেন এবং ইমাম আলী (আঃ) - এর শ্রেষ্ঠতার প্রসঙ্গে এই আয়াত উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম হুসাইন (আঃ) - এর শাহাদাতের খবর শুনে উম্মুল মু’মেনীন উম্মে সালামা এই আয়াতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ও ইরাকবাসীদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, এবং ওয়াসিলাতও একই কাজ করেছিলেন। ইমাম আলী ইবনে হুসাইন (আঃ) সিরিয়বাসী লোকটির, যিনি মুয়াবিয়ার প্রশংসা করেছিলেন এবং

মহানবী (সাঃ) -এর আহলে বাইতের সদস্যবর্গকে গালি-গালাজ করছিলেন, সাথে আলোচনাকালে এ আয়াতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

এভাবে “আয়াতে তাতহীর” এবং “হাদীস আল কিসা” আসহাবে কিসার লোকদের জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মান নির্দেশ করে, যারা যে কোন ধরণের দাষ- ক্রটি এবং অপবিত্রতা হতে মুক্ত। তারা নিষ্পাপ (মাসুম), পরিশুদ্ধ, এবং যে কোন পাপ হতে নিষ্কলুষ। সতরাং তারা মুসলিম উম্মাহর নিরংকুশ আনুগত্যের কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করেন। এই কর্তৃত্ব কেবলমাত্র যৌক্তিকতার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয়, বরং মহানবীর (সাঃ) সংকল্প ও পরম ইচ্ছার প্রতিপালনের জন্য; (এই অনুযায়ী) মুসলিম উম্মাহর অন্যদের তুলনায় নির্ভুলভাবে তাদের (আহলে বাইতের) গুরুত-মর্যাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ও তাদের প্রতি বিশেষ মনযোগ প্রদান করার জন্য ।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্রঃ

১. ইমাম আলী (আ.) এর নাহজুল বালাগা, খুতবা ২০১; বুখারী শরিফ- অধ্যায় ‘ইলম’, নবীজীর প্রতি মিথ্যারোপকারী ব্যাক্তির গুনাহ; ইবনে হাজার আসকালানী(ফাতিহুল বারী), সহী বুখারীর টীকা, খন্ড১, পৃঃ২০৯।

২. ইবনে খুজায়মাহ(তাওহীদ) মাকতাবাহ আল কুলত্নীয়াত আল- আজারিয়াহ, মিশর(হিজরী ১৩৮৭) । আরও দেখুনঃ সাইয়্যেদআবদ আল হোসায়েন শার ফুদ্দীন আমূলী কালিমাহ আল- রুইয়া, নাজাফ আল আশরাফ- এর নূমান থেকে মুদ্রিত ।

৩. শিয়া- সুন্নী উভয় মাযহাব লিখিত “ওহীর সুচনা” সম্পর্কিত আলোচনা।

৪. সাইয়েদ আব্দ আল হোসাইন শরফুদ্দিন আমলী(মাসাইল আল ফিত হিয়াহ) নাজম আল দীন আসকারী(আল- ওজু)।

৫. হোসায়েন মুজাফফর লিখিতঃতারিখে আল শিয়া।

৬. দেখুনঃআল- সুলতান জহির বায়লারাস বান্দ কিনারী হিঃ৬৬৫ সালে এই ব্যাপারে একটি ঘোষনাপত্র ইস্যু করেঃ মাকারিজি- র ‘খুতাত,

৭. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ৪ ইমাম।

৮. আশারী হচ্ছেন আবুল হাসান বিন ইসমাইল, যিনি ইন্তেকাল করেন ২৪১হিঃ সালে, এই দলের সম্পরকে বিস্তারিত জানতে পড়ুন ‘ওনধৎ’ বইটি)

৯. সুন্নিগনের বি াস ৬টি হাদিস গ্রন্থের সব হাদিস সত্য।

১০. এই শব্দটির মুল হচ্ছে ‘রাফজ’ যার মানে হলো বাতিল করা, ফেলে দেওয়া, অবাঞ্ছিত কিছু পরিত্যাগ করা, প্রত্যাখ্যান করা।এই পরিভাষা শিয়াদের জন্য ব্যবহার হতো, কারন ঐতিহাসিকভাবে শিয়াগন সত্যের বিপরীতে নিষ্ঠুর হুকুম- নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতো।

১১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৩/৪, ১৭২৯২৬ এবং ৫/১৮২, এবং সহীহ (মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা) তিরমিজীর “মানাকিব” অধ্যায়।

১২. সহি(মুঃ বিন ঈসা) তিরমিজির ১/১২৫ এবং খন্ড ১/১৪, অধ্যায়ঃ “ফজল আল ইলম” “তাবলিগ আল- হাদিসা’ন রাসুলুল্লাহ”মুঃ বাকির মাজলিসির বিহারুল আনোয়ার, ১/১০৯/১১২ ।

১৩. শামস উদ্দিন আয যাহাবী “তাজকিরাতুল- হুফফাজ” ১/৫।

১৪. শামস উদ্দিন আয যাহাবী “তাজকিরাতুল- হুফফাজ”। নাহজ আল- বালাগা, খুতবা নং ৩, শাকশাকিইয়াহ।

১৫. মুঃবিন সাদ, আল- ওয়াকিনির অনুলেখক “আল তাবাকাতুল- কুবরা” ৩/২৮৭, ইবনে আব্দ আল- বার “জামিউল বাইয়ান আল ইলম ওয়া ফাজলিহি” ১/৬৪- ৬৫।

১৬. ইমাম আলী ইবনে আবিতালিব, নাহজ উল বালাগা, খুতবা ৩; বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন “আব্দুল্লাহ বিন সাবা”, পৃঃ১/১৪২- ১৫১, ২য় প্রকাশ।

১৭. আহমদ বিন বালাজুরী, ”আনসাব আল- আশরাফ”৫/৪৯।

১৮. “আল- হাদিছ- ই- উম্মুল মু’মেনিন আয়শা” অধ্যায়- আলা আহদ আল সাহরাইন/১১৫।

১৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনীর গ্রন্থ “রাওজাতুল কাফী”৮/৬১- ৬৩তে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

২০. মাসুদী, ”মুরুজ আল- জাহাব”৩/২৫২, দার আল- আন্দালিস প্রেস। ২১২ হিজরি।

২১. মুরতাজা আল- আসকারী, "আহাদিস- ই- উম্মুল মু' মেনিন আয়শা"পৃঃ- ২৮৯ এবং, তেহরান ১৩৮০ হিজরী" ।

২২. সহী বুখারী, ১ম খন্ড, বিষয়ঃ"ফজল আল- সুজুদ", অধ্যায় ৯ "আল- সিরাতজসর জাহান্নাম"। মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরি, সহীহ খণ্ড ১, বিষয়ঃ"মারিফাহ তারিখ আল- রুইয়াহ"।

২৩. সহি মুসলিম, বিষয়ঃমানলা আনাহু আল- নবী বা “জায়ালাল্লাহ লাহু জাকাতান ওয়া তহুরান&r dquo ।

২৪. “আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা”, লেখক- সাইয়েদ মুরতাজা আশকারী রঃ, ১ম অধ্যায়।

২৫. সুনানে দারামি ১/১৩২, মুঃ ইবনে সা’দের “তাবাকার আল- কুব্রা”২/৩৫৪।

২৬. মুঃ ইবনে আল- হাসান তুসীর “ইখতিয়ার মারফা আল- রিজাল” যা “রিজাল কাশী” নামে পরিচিত এবং আল্লামা বাকির মাজালিশীর “বিহারুল আনোয়ার”৯/৬৩২।

২৭. মুঃ ইবনে আল- হাসান তুসীর “ইখতিয়ার মারফা আল- রিজাল” যা “রিজাল কাশী” নামে পরিচিত এবং আল্লামা বাকির মাজালিশীর “বিহারুল আনোয়ার”, ৭৬- ৭৭।

২৮. উম্মুল মু’মেনিন আয়েশা, আবু হোরায়রা, আনাস ইবনে মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ বিন আমর, মুগিরা বিন শোবাহ এবং সামরাহ বিন জুন্দুর- এর মত লোকেরা ছিল এর বর্ণনাকারী। আরো তথ্যের জন্য জানুন “আল হাদিসুন উম্মুল মু’মিনিন আয়েশা” এবং “মিন তারিখ আল- হাদিস”। সাইয়েদ আবুল হোসাইন শারফুদ্দিনের “আবু হোরায়রা”, শেখ মাহমুদ আবু রাইয়াহ- র “আজওয়া আলা সুন্নাহ আল- মুহাম্মাদিয়া” এবং শেখ আল- মুজিরাহ।

২৯. আব্দুল মালিকের অনেকগুলো কার্যক্রমের একটি হলো হজ্জ করার জন্য লোকজন কাবা ঘরের পরিবর্তে জেরুজালেম যাবে এবং তৈরীকৃত ঘর তাওয়াফ করবে, কিন্তু এই উদ্ভাবন ধোপে টেকেনি। দেখুনঃ "তারিখ আল ইয়াকুবী"৩/৭- ৮, নাজাফে প্রকাশিত।

৩০. দেখুনঃহাদিসের উপর সকল সুন্নি বই।

৩১. "আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাহ", ২য় খন্ড, লেখক- সাইয়েদ মুরতাজা আশকারী (রঃ)।

৩২. দেখুনঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাহ", ২য় খন্ড, লেখক- সাইয়েদ মুরতাজা আশকারী (রঃ)।

৩৩. বালাজুরীর বিশালাকার ইতিহাস গ্রন্থ "আন্সাব আল- আশরাফ" এবং মাসুদীর মধ্যমাকার ইতিহাস গ্রন্থ "আখবার আল- জামান" এবং "আওসাত" হতে সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত।

৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব- এর মাতা আসমা ছিলেন 'আমীস খাসামায়ইয়া'- এর কন্যা। তিনি ইথিওপিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সাঃ) - এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তার ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তার জীবনী আসাদ আল- গাবা"- র খণ্ড ৩- এর পৃষ্ঠা- ৩৩ এ লিপিবদ্ধ আছে।

৩৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিশাপূরী, হাকিম নামে বহুল পরিচিত, একজন অন্যতম হাদীস বেত্ত্বা এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। তিনি ৪০৫ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।

৩৬. আ'য়শা ছিলেন পথম খলিফা আবু বকরের কন্যা । মদীনায় হিজরতের ১৭ মাস পর মহানবী (সাঃ) তাকে বিবাহ করেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ৫৭, ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরী সনে (সন সঠিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় নি) এবং আবু হুরায়রা তার জানাজার নামাজে ইমামতী করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তার জীবনীর জন্য দেখুন, আহাদীস- ই আয়শা"।

৩৭. সম্ভবতঃ হযরত আয়শা বুঝাতে চেয়েছেন, মহানবী (সাঃ) চাদরটিসহ তার ঘর হতে বের হয়ে উম্মে সালামার ঘরে যান।

৩৮. উম্মে সালামা হিন্দ, উবি উমাইয়া কোরায়শী মাখজুমীর কন্যা, স্বামী আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদ- এর মৃত্যুর পর মহানবী (সাঃ) - এর সহিত বিবাহের সম্মান পেয়েছিলেন। তার স্বামী আবু সালমা ওহুদ যুদ্ধে আহত হন এবং এর ফলে মত্যু বরণ করেন। তিনি মত্যু বরণ করেন ইমাম হোসাইন (আঃ) - এর শাহাদাতের পর। তার জীবনী আসাদ আল- গাবা"- এব তাহজীব আল- তাহজীব" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

৩৯. উমর উম্মে সালমা'র প্রথম স্বামী আবু সালমা'র ঘরের সন্তান। তিনি ইথিওপিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিফফীন যুদ্ধে ইমাম আলী (আঃ) - এর অন্যতম অনুসারী ছিলেন এবং ইমাম আলী (আঃ) তাকে বাহরাইন এবং ফারস (বতমান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি অংশ সেই সময় ফরস নামে পরিচিত ছিল) এর গভর্ণর নিয়োগ

করেছিলেন। উমর ৮৩ হিজরী সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী আসাদ আল- গাবা" খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা- ৭৯ তে লিপিবদ্ধ আছে।

৪০. ওয়াসিলাত ইবনে আসকা ইবনে কা'ব লাইসি তাবুক যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (সাঃ) - এর খাদেম হিসেবে তিন বছর কাজ করেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে দামেস্কে অথবা বায়তুল মোকাদ্দিসে ইন্তেকাল করেন। তার জীবনীর জন্য দেখুন, আসাদ আল- গাবা" খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা, ৭৭।

৪১. আবু সাঈদ খুদরী খাজরাজী। তার নাম ছিল সা'দ ইবনে মালিক আনসারী। তিনি খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স ছিল ৬০ ঊর্দ্ধ বা ৭০ ঊর্দ্ধ । আসাদ আল্ গাবায়" তার জীবনী আছে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা- ২৮৯)।

৪২. ১ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, রাসূলের (সাঃ) - এর চাচাতো ভাই, মদীনায় মহানবীর হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬৮ বছর বয়সে তা'য়েফে মত্যু বরণ করেন। তার জীবনীর জন্য দেখুন, "আসাদ আল- গাবা"।

৪৩. আবুল কাসিম বা আবু মুহাম্মদ জাহহাক ইবনে মুজাহিম হিলালী। ইবনে হাজার বলেনঃ তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী ছিলেন এবং সঠিক উৎস হতে সংগ্রহ করে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। জাহহাককে পঞ্চম পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। "তাহজীব আল- তাহজীব" গ্রন্থে তার জীবনীর বর্ণনা আছে।

৪৪. যায়েদ বিন আরকাম আনসারী খাজরাজী, যাকে তার স্বল্প বয়সের কারণে রাসূল (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অনুমতি দেন নাই, কিন্তু অন্যান্য যুদ্ধে তাকে সাথে নিয়েছেন। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে ইমাম আলী (আঃ) - এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন এবং ইমাম হোসাইন (আঃ) - এর শাহাদাতের পর কুফায় ইন্তেকাল করেন। "আসাদ আল- গাবা"- তে তার জীবনী উল্লেখ আছে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা, ১৯৯)।

৪৫. চার জন ব্যক্তির নাম "কোতাদা" হিসেবে উল্লেখ আছে, যথাঃ সাদ্দুসী, রিওয়াভী, কায়সী এবং আনসারী। তারা প্রত্যেকেই বি স্ত। তাদের মধ্যে কোনজনের সূত্রে ইহা বর্ণিত হয়েছে তা জানা যায় নি। তাদের জীবন বৃত্তান্তের জন্য দেখুন "তাহজীব আল- তাহজীব"।

৪৬. আবু বাজরা আসলামী মহানবী (সাঃ) - এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি ৬০ বা ৬৪ বছর বয়সে কুফায় শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। "আসাদ আল- গাবা"- য় তার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

৪৭. আনাস ইবনে মালিক খাজরাজি। তিনি মহানবী (সাঃ) - এর খেদমতে ১০ বছর অতিক্রান্ত করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ৯০ বছর বয়সে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তাদের জীবন বৃত্তান্তের জন্য দেখুন "আসাদ আল- গাবা"।

৪৮. আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। "সহীহ" সংকলকগন প্রত্যেকেই তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে হাজার বলেন : তিনি তৃতীয় পুরুষের একজন বি স্ত /নির্ভর যোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী"। তিনি ১০৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (তাকরিব আল- তাহিজন" খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৮৭)।

৪৯. আমর বিন মায়মুন একজন নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীন হিসেবে গণ্য । সিহাহ্ সিত্তায় তার হাদীস অন্তর্ভূক্ত আছে। ৭৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। "তাকরীব আল- তাহজীব" খণ্ড ২, প্ দ্দা- ৮০।

৫০. সেই সময় কাপড় ঝাকানোকে বিরক্তির চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই ৯ (নয়) ব্যক্তি ইমাম আলী (আঃ) সম্পর্কে অশোভন ভাষা ব্যবহার করার ঘটনায় ইবনে আব্বাস এরূপ উক্তি করেছিলেন।

৫১. আবু আম্মার শিদ্দাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল- কারশি দামেস্কের অধিবাসী। তিনি চতুর্থ যুগের নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। সিহাহ সিত্তাহ- এর মধ্যে তার হাদীস সহজলভ্য । "তাকরীব আল- তাহজীব" খণ্ড ১, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।

৫২. এই বিষয়ে আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো উদ্ধৃত করা হতে আমরা বিরত থাকলাম। উদাহরণস্বরূপ "আসাদ আল- গাবা" (খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা- ৪১৩) "আবাসা" (খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা- ৪৭৯) এবং "তারিখে- বাগদাদ" (খণ্ড - ১০, পৃষ্ঠা- ২৭৮) - এ "আতিয়া'- র জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা, এবং তাফসীরে তাবারী" (খণ্ড - ২২, পৃষ্ঠা - ৫), "মুসনাদ আহমাদ" (খণ্ড - ৬, পৃষ্ঠা - ৩০৪), "আসাদ আল- গাবা" (খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ১২ এবং (খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৯), "মাজমাউল জাওয়াদ" (খণ্ড - ৯, পৃষ্ঠা - ২০৬ - ২০৭) এবং জাখায়েরুল উকবা" (পৃষ্ঠা- ২১) - এ হাকিম বিন সাঈদ এর বর্ণনা রয়েছে।

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা 4

গ্রন্থকার পরিচিতি. . . . 6

প্রথম খণ্ড 8

ঐশী ধর্ম কেন সনাতন করা হয়? 9

ইসলামী উম্মাহের মধ্যে মতভেদের কারন 10

দ্বিতীয় খণ্ড 21

পরিশিষ্ট 39

কিসার ধরন ও প্রকৃতি. . . . 42

নবী পরিবারের সদস্যগণ যে স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন. . . . 44

যখন আয়াতটি নাজিল হয় তখন ঘরে কতজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন 46

হাদীসসমূহে উপস্থাপিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা 48

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূল (সাঃ) কী করেছিলেন? 50

পূববর্তী বর্ণনাসমূহের সারাংশ 59

তথ্যসূত্রঃ. . . . 63